অরূপের রাস

জগদীশ গুপ্ত

১

রাণুর সঙ্গে আমার ভাব ছিলো—

কিন্তু হঠাৎ একদিন আড়ি হইয়া গেলো।

রাণু ছোটো, আমিও ছোটো; সে সাত, আমি চৌদ্দো বছরের। ... বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই শ্রেষ্ঠ হয় না, তথাপি বয়ঃকনিষ্ঠদের সম্বন্ধে বয়োজ্যেষ্ঠদের সহজ একটা দায়িত্ব বুঝি থাকেই, বিশেষত যদি প্রতিবেশী হয়।

রাণুর সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব ছিলো ... শারীরিক কোনো হানি না হয় ইত্যাদি।

তত্ত্বাবধায়কের পদগুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মাঝে-মাঝে তাহাকে শাসন করিতেও যাইতাম; কিন্তু সে শাসনের ফলে তাহার সংশোধন কতদূর হইত তাহা নির্দেশ করিতে যাওয়া, তার রূপের ব্যাখ্যার মতোই নিষ্প্রয়োজন।

আমার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া আমার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িতো; বলিতো, — 'কানুদা একটা বড়ো মানুষ কি না, তাই বক্‌তে বসেছে।' হি, হি, হি,।...

কিন্তু হতোদ্যম আমি কখনোই হই নাই।

রাণুর পিতা যদুগোপাল দত্ত মহাশয় অবস্থাপন্ন নহেন, নিঃস্বও নহেন! তাঁর চাকরিতে উপরি পাওনাও ছিলো; এই পয়সাটা অধর্মের পয়সা - কিন্তু মাহিনার অল্প টাকাতেই সাংসারিক খরচটা কুলাইয়া ঐ অধর্মের পয়সার সবটাই জমিতেছে।

জন্ম মৃত্যু, পাশ, ফেল, আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি, বিবাহ- এই রকমের সামান্য পারিবারিক পরিবর্তন ছাড়া গৃহস্থ বাঙালির ঘরে উল্লেখযোগ্য বড়ো কিছু ঘটে না; আমাদেরও ঘটে নাই। আমি একবার ফেল, একবার পাশ করিয়াছি, আর একবার কী করিবো তাহা দৈবের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি; যদুগোপাল বাবুর চার টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াচে, এবং আর একটা বৃদ্ধি আসন্ন হইয়াছে...

রাণুর বয়স দশ, আমার সতেরো।

রাণু আমার পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া আমার পাঠ্য পুস্তকের নেলসনের মৃত্যুদৃশ্যের উপর আঙুল রাখিয়া বলিলো,—এটা কিসের ছবি, কানুদা?

—যুদ্ধের ছবি। এই লোকটার বুকে গুলি লেগেছে, গুলি খেয়ে সে মরছে। বলিয়া ডান হাত দিয়ে মরণোন্মুখ নেলসনকে দেখাইয়া দিলাম এবং বাঁ হাত দিয়া রাণুর কটি বেষ্টন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

চট করিয়া একবার পিছন দিককার দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাণু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলো, — আর কী কী ছবি আছে দেখাও।

রাণুর ঐ চট- করিয়া দরজার দিকে চাহিবার অর্থটা আমার না বুঝিবার কথা নয়—

এবং অক্লেশে তাহা বুঝিয়া ফেলিয়া দশ বৎসরের বালিকার এই অকাল পরিপক্কতায়

আমার বিস্ময়ের সীমা রহিলো না। কিন্তু আমার কী দুর্মতি ঘটিলো জানি না, সকৌতুকে হাসিয়া বলিলাম— ঢের ছবি আছে; কিন্তু আগে তুই বল, তুই ছবি দেখতেই এসেছিস না আর কোনো মতলব আছে?

মনে হইলো, রাণু এই ঘুরানো কথাটার অর্থ ধরিতেই পারিবে না; তবু, পারি কিনা দেখিবার জন্য একটা উৎকণ্ঠাও জন্মিলো।

রাণু তৎক্ষণাৎ কথাটার উত্তর দিলো না— খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিলো,—এসেছিলাম তুমি রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে ব'সে আছো তাই শুনে। ছবি দেখা মিছেকথা।

চঁচাইয়া বলিলাম, —রসগোল্লা খেয়ে যা, রাণু।

রাণুও তখন চিৎকার করিয়া বলিতেছিলো, — রাধা, পুতুলের একটা বাক্‌শোর একটা টোপ শেলাই করবো, দুপুর বেলা একটিবার আসিস্, ভাই। তাহার চিৎকারে আমার ডাক ডুবিয়া গেলো।

আমার উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইল, কিন্তু পরাজয়ের একটা অব্যক্ত লাঞ্ছনায় আমি নিবিয়া একেবারে অন্ধকার হইয়া গেলাম। ব্যাপারটা নিছক কৌতুক, কিন্তু হঠাৎ বিশ্রী হইয়া গেলো।

দুদিন পরে রাণু আসিয়া খবর দিল-কানুদা, আমার বিয়ে।

—বলিস কী?

—হ্যাঁ, সত্যিই। কাল দেখতে আসবে।

বিস্ময়ের কারণ এ সংবাদে কিছুই নাই। বিবাহরূপ পরিবর্তন বাঙালির জীবনে নিত্য ঘটিতেছে—কাহারো অল্প, কাহারো বেশি, কাহারো মধ্য বয়সে। রাণুর না হয় দশম বৎসরেই সেই সাধারণ পরিবর্তনটা ঘটিয়া যাইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, — কোথায়?

— তা জানিনে বাবা-মা ভারি ব্যস্ত। কতরকম খাবার তৈরি হচ্ছে। খেয়ে এলাম।

জিহ্বায় জল আসিলো—পুলকিত কণ্ঠে বলিলাম, — নিয়ে আয় কিছু, আমিও খাই।

আনছি। বলিয়া রাণু চলিয়া গেলো।

আঁচলের আড়ালে লুকাইয়া একটা বাটি আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া ঠেলিয়া দিয়া রাণু কহিলো,— খাও।

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে মুখে বলিলো "খাও" কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে আহ্বানের বাষ্পমাত্রও ছিলো না, বরং বিরুদ্ধ দিকেই যেন একটা ধাক্কা অনুভব করিলাম। হঠাৎ এ রাগ কেন?

যখন সে যায় তখন তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি নাই; কিন্তু এখন লক্ষ করিলাম, রাণুর মুখাবয়বের প্রত্যেকটি রেখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

রাণু বলিলো, — খাচ্ছো না যে?

কণ্ঠস্বর কর্কশ শুনাইল।

- তুই রাগ ক'রে দিলি কেন? রাগ ক'রে খাবার ঠেলে দিলে কেউ খেতে পারে?

রাণু উত্তর দিলো না।

একটু মুচকি হাসিয়া বলিলাম, চুরি ধরা প'ড়ে গেছে বুঝি?

—চুরি করিনি, চেয়ে এনেছি।

— তবে বামুনকে খেতে দিতে রাগ করলি কেন?

pathagar.net

— রাগ কই করলাম! বললাম খাও।

আমি তাহার দিকে বাটিটা ঠেলিয়া দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমারও রাগ হইয়াছিল। ... এতো ভুরু কোঁচকানো কিসের?...

উঠানে একটা কুকুর শুইয়াছিল.

রাণু দ্রুতপদে নামিয়া যাইয়া তাহারই সম্মুখে সেই দুধ, ক্ষীর, ছানা, সরের মিষ্টান্নগুলি বাটিশুদ্ধ উপুর করিয়া ঢালিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেলো।...

পূর্বে যে আড়ির কথা বলিয়াছি, এই ঘটনা তাহার সূত্রপাত।—

রাণুর রূপ-গুণের পরীক্ষা হইবে।

দেখিতে গেলাম।

প্রথমেই দৃষ্টি পড়িলো ধোঁয়ার আড়ালে লুকানো-মখি একখানি দেহের উপর...

ধূমাকর্ষণের আর বিরাম নাই... নিরবচ্ছিন্ন ধূমপটল এক সময় সরিয়া যাইতেই দেখিলাম, কাঁচা-পাকা মোটাসোটা প্রৌঢ় একটি ভদ্রলোক হাত বাড়াইয়া রাণুর বাবার হাতে হুঁকা দিতেছেন!...

বারান্দায় একটা মাদুর বিছানো হইয়াছে; তাহারই উপর রাণুর বাবা কন্যার পিতার মতো সবিনয়ে, বরের যে-ই হোন, তিনি বরপক্ষীয় কর্তাব্যক্তির মতো মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া আছেন; এবং আমারই বয়সী একটি ছোঁড়া অধোমুখে মাদুরের বয়ন-কৌশল প্রাণপণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখা শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না!

বুঝিলাম, এটা দূত, পাত্রকে গোপনে কনের রূপের কথা শুনাইবে।

পাত্রপক্ষীয় সেই কর্তাব্যক্তি বলিলেন, মেয়ে পছন্দ হইবে। যেমন শুনেছি ঠিক তেমনটি যদি না-ও হয় তবু আপনার মেয়ে সুন্দরীই।

যদুগোপালবাবু বলিলেন, —মায়ের আমার স্বাস্থ্যও খুব ভালো। —হবেই তো, একটিমাত্র সন্তান ঐ মেয়েটি, খাইয়েছেন দাইয়েছেন ভালোই। দেশের মেয়েরা তো না খেতে পেয়েই আকারে ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে তাদের যে সন্তান হচ্ছে তারাও আকারে ছোটোই হচ্ছে। বলিয়া ভগ্নোদ্যমের মতো তিনিও যেন আকারে কিছু ছোটো হইয়া গেলেন।

যদুগোপাল বাবু নিঃসংশয়ে বলিলেন, — আজ্ঞে, তাতে কি আর সন্দেহ আছে! আমার তো মনে হয়, ছোটো হ'তে হ'তে একদিন বাঙালি ব'লে কোনো জাত পৃথিবীতে থাকবে না।...

আমার কিন্তু হাসি পাইতে লাগিলো।—

কন্যাদায় বিপদ নিশ্চয়ই; এই কনে দেখাদেখির ব্যাপারটা সমগ্র কন্যাদায়ের অংশ হইলেও, উদ্ধারটা প্রধানত উহারই উপর নির্ভর করে বলিয়া ঢের বেশি জাগ্র। ... উৎকণ্ঠায়-আশঙ্কায় বুক ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে কন্যার পিতা একবার কন্যার মুখাবলোকন এবং একবার পরীক্ষকের মুখাবলোকন করিয়া একবার কন্যার শ্রী, একবার অন্বেষড় করে পরীক্ষকের প্রীতি।... স্বর্ণপ্রতিমার সহিত যে-কন্যার রূপের উপমা চলে সেই কন্যার পিতার পরমাত্মাও এই সময়ে শুকাইয়া উঠিয়া দুলতে থাকে; অথচ জীবনের ট্রাজিডি এমনি উৎকট যে ঠিক এই সময়টিতেই, মন যখন টাটায় তখন, মনের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন রাখিয়া তোশামোদকে বিনয়ের বেশে বাহির করিয়া বহু মিষ্টকথা উচ্চারণ করিতে হয়। ব্যাপারটা কষ্টের হইলেও ভিতরে-ভিতরে হাস্যকরই।-

সে যা-ই হোক, কর্তা বলিলেন, — পুরুষদেরও সেই কথা। তারাও কি পেট ভ'রে খেতে পায় ভেবেছেন? হুঁ!

যদুগোপালবাবু পূর্বে এ-বিষয়ে কিছু ভাবিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু বাঙালি পুরুষদের

pathagar.net

আধপেটা দুরবস্থার বার্তা কর্তার মুখে যেন হঠাৎ এই প্রথম পাইলেন এমনি বিস্ময়ে তাঁর চোখ খুব বড়ো হইয়া উঠিলো; বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, — আজ্ঞে না, বিস্তর পুরুষ আছে যারা বারোমাসই একরকম—

বোধহয় বলিতে যাইতেছিলেন, অনাহারে কাটায়।

কিন্তু কর্তা তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিলেন না; বলিলেন,— বেলা বেড়ে যাচ্ছে, বেশিসাজগোজের দরকার নেই, বাড়িতে যেমন থাকে তেমনি আনতে বলুন।

যদুগোপালবাবু এবার বাঙালি পুরুষ সাধারণের দুরবস্থার সঙ্গে নিজের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া আরও ম্রিয়মাণ হইয়া কহিলেন— গরিবের ঘরের মেয়ে সাজগোজ কোথায় পাবো যে তাকে সাজাবো, বেয়াই! -তারপর কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া বলিলেন, — ঝি, হ'লো তোমাদের?

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিলো, — হয়েছে।'বয়াই' —ইনি তবে পাত্রের পিতা স্বয়ং।

একটু পরে ঝি হাত ধরিয়া রাণুকে চৌকাঠের ধারে আনিতেই সেইদিকে চাহিয়া আমার মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেলো — বাঃ!

শাদা শেমিজের উপর লাল চওড়া পেড়ে একখানা কাপড় পরনে, লাল একটা রেশমি ফিতা দিয়া মাথার মাঝখানটা বাঁধা, কপালের উপর চুলের পাতা, পায়ে আলতা, দুই ভ্রূর মাঝখানে ছোট্টো একটি কালো টিপ;—

পরীক্ষা দেবার উপযোগী বেশ পারিপাট্য রাণুর মাত্র এইটুকু,—

কিন্তু এই নিতান্ত সাধারণ বেশেই রাণুর রূপ অসাধারণ নূতন মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া আমার চোখে পড়িয়া গেলো!

রাণুর মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া যদুগোপাল বাবুর বেয়াই বলিলেন- বাঃ-ই বটে। এসো, মা, এসো, ব'সো।' বলিয়া সম্মুখস্থ খালি স্থানটিতে হাত রাখিলেন।

ধীরে-ধীরে নামিয়া আসিয়া রাণু তাঁহার সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া বসিলো; ঝি পাশের দিকে মুখ করিয়া তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিলো।

কিন্তু আমার বুকের ভিতরকার বাক্‌স্ফূর্তি যেন অকস্মাৎ অবরুদ্ধ হইয়া গেলো। বহুদূরের কুজ্ঝটিকার আবরণ যেমন দেখায় তেমনি একটা অনির্দেশ্য অস্পষ্ট ইচ্ছায় আমার মনের আকাশ ধীরে ধীরে আবিল হইয়া উঠেত লাগিলো।

হঠাৎ চমক ভাঙিয়া শুনিলাম, বেয়াই বলিতেছেন, আপনার মেয়ে সুলক্ষণা এবং সুন্দরী বটে; সচরাচর এমনটি চোখে পড়ে না। নামের খ্যাতি যেমন শুনে এসেছিলাম তার শতগুণ বেশি রূপবতী আপনার মেয়ে। কানে শুনে এ-রূপ ধারণা করা যায় না। এ-মেয়ে আমি নেবো। বলিয়া রাণুর হাত দুখানি তুলিয়া ধরিলেন।

যদুগোপালবাবু বলিলেন, — আপনার অগাধ দয়া।

— দয়া নয়, গরজ। আপনার মেয়ের অদৃষ্টে আমার ছেলে রাজা হবে।

যদুগোপাল বাবু হাসিলেন—

কিন্তু হাসিলেন বলিলে যেন ঠিক হয়; বেয়াইয়ের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের টানে তাঁহার প্রাণের আনন্দ ও গর্ব যেন এক ঝলক উছ্‌লিয়া পড়িলো।

আমিও মনে-মনে সর্বান্তকরণে কর্তার উক্তির সমর্থনই করিলাম। রাণুকে যে বিবাহ করিবে সে যে রাজ্যেশ্বরের মতোই ভাগ্যবান, এবং দুটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সে যে রাজৈশ্বর্যই গৃহে লইয়া যাইবে তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই।-

যদুগোপাল বাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত এদিক-ওদিক করিয়া পণের কথাটা তুলিয়া ফেলিলেন;

বলিলেন, বড়ো দরিদ্র আমি, শুধু মেয়েটিকেই নিয়ে বসে আছি; তাকে কি দিয়ে বিদায় দেবো সে-সংস্থান—

যদুগোপালবাবু যেন কত বড়ো একটা লজ্জাকর শ্রুতির অযোগ্য কথা কহিতে শুরু করিয়াছেন এমনি শশব্যস্তে বেয়াই জিব কাটিয়া বসিলেন; বলিলেন, - সর্বনাশ! অমন কথাও বলবেন না। স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে নিয়ে যাবো, তিনিই আমার ঘর ধনে-পুত্রে পূর্ণ ক'রে তুলবেন। আপনার দু-এক হাজারের ওপর আমার লোভ নেই।

শুনিয়া, কেন জানি না, আমারই চোখে জল আসিলো।

এই দুঃসহ সুসংবাদটা যদুগোপাল বাবুর একেবারেই অপ্রত্যাশিত। যদুগোপাল বাবু স্থির দৃষ্টিতে মিনিটখানেক বেয়াইএর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আচম্বিতে তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন।

বেয়াইয়ের এ-বিপদটাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

নিজের কথার ফলে এ-হেন সঙ্কটে পড়িতে হইবে জানিলে তিনি বিনাপণে রাজ-লক্ষ্মী ঘরে তুলিবার শুভ-ইচ্ছাটা মুখোমুখি না বলিয়া বোধ করি ডাকযোগেই জ্ঞাপন করিতেন। —মোটা মানুষ, তাহার উপর পায়ের উপর আস্তো একটা মানুষ উপুড় হইয়া পড়িয়া—সহসা পিছে হটা বা উঠিয়া দাঁড়ানো বেয়াইয়ের সাধ্যাতীত; সে চেষ্টাও তিনি করিলেন না। যদুগোপাল বাবুর দুই কাঁধ তিনি দুই হাতে ধরিয়া পায়ের উপর হইতে তাঁহাকে একরকম ঠেলিয়াই, এ কী কাণ্ড আপনি ক'রে বসলেন, মেয়ের সামনে আপনি আমাকে লজ্জা কেন দিলেন। চোখে আপনার জলই বা কেন?

রাণুর মুখের দিকে চাহিলাম—

তার রাগ দেখিয়াছি, কান্না দেখিয়াছি, অবাধ্যতা দেখিয়াছি, চঞ্চলতা দেখিয়াছি—

কিন্তু লজ্জা দেখিলাম এই প্রথম—

রঙের এই লীলাপুলক।—

নিম্নের সকল বাষ্পাচ্ছন্নতা অস্পষ্টতার ঊর্ধ্বে সদ্যোত্থিত সূর্যের শোণিতাভা শৈলশীর্ষে যেমন

তেমনি করিয়া রাণুর এই প্রথম লজ্জার রক্তরাগ আমার অন্তরায়তনের সর্বোচ্চ স্থানটি দীপ্ত করিয়া স্পর্শ করিয়া রহিলো।

এ-কাণ্ড কেন করিলেন, মেয়ের সামনে বেয়াইকে কেন লজ্জা দিলেন, তার চোখেই বা জল কেন? যদুগোপাল বাবু এ প্রশ্নত্রয়ের একটিরও উত্তর দিলেন না; বেয়াইয়ের ঠেলায় খাড়া হইয়া বসিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, আমার মেয়ের বড়ো সৌভাগ্য যে আপনার মতো মহাপুরুষের ঘরে সে যাবে। রাণু, তোমার শ্বশুরকে প্রণাম করো, মা।

রাণুর চোখের পক্ষ্মরাজির সূক্ষ্ম কৃষ্ণ রেখাটা শুধু দেখা যাইতে ছিল—

এইবার সে চোখ তুলিয়া ভাবী শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিলো; তারপর চোখ নামাইয়া হাত বাড়াইয়া অত্যন্ত ধীরে-ধীরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলো। তিনি বিড়বিড় করিয়া অস্পষ্ট ভাষায় রাণুকে বোধহয় আশীর্বাদ করিলেন; এবং ঝিকে বলিলেন, — মাকে ঘরে নিয়ে যাও, দেখা শেষ হয়েছে।

ঝি রাণুর হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলো! তার পিঠের উপর এলানো চুলে বাতাসে একবার দুলিয়া উঠিলো পায়ের আলতার আভা চোখে পড়িলো একটা মিষ্ট গন্ধ নাকে গেলো। ।

সবই বুঝিলাম, কেবল বুঝিলাম না ইহাই যে শুধু 'মিষ্টিমুখ' করিতে বসিয়া যদুগোপালবাবুর বেয়াই এতো মিষ্টান্ন গহ্বরস্থ করিলেন কেন?— সেই দূতটাও গিলিলো অনেক।

pathagar.net

বোধহয় বাপ-মায়ের আদেশেই রাণু বাড়ির বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াদুর্লভদর্শনহইয়া উঠিলো। তা উঠুক তিনমাস... পরেই যে-মেয়ে শ্বশুরালয়ে যাইবে তাহার নৃত্যপরায়ণতা মানায় না।...

কিন্তু মাঝখান হইতে আমি তাহার চক্ষুশূল হইয়া উঠিলাম কেন! — অনেক ভাবিয়াও কারণটা ঠিক করিতে পারি নাই।... কথা বলা একদম বন্ধ করিয়া দিয়াছে; দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়— যেন আর সেই তার মুখচিনাচিনিও নাই।... একদিন দৈবাৎ তাহাকে হাতের কাছে পাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলাম; তাহাতে সে হঠাৎ এমনই গর্জন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছিলো যে, আমি সাত তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পলাইবার পথ পাই নাই।...

বাঙালির মেয়ে শিশুকাল হইতেই বিবাহের কথায় লজ্জা পায়-

বিবাহের পাত্র স্থির হইয়া গেলো, তা সে যতো ছোটো মেয়েই হোক না, কেমন ভাবভারতিক ভাব ধারণ করে।... আমি এখন রাণুর কাছে পরপুরুষ, রাণু তাই আমাকে লজ্জা করিতেছে; এবং সেদিনকার সেই মিষ্টান্নঘটিত ব্যাপারে অপমান বোধ করিয়া সে রাগ করিয়া আছে তাহা নহে!... লজ্জা রাগ এক কথা, বিরাগভরে পরিহার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা- একটিকে অন্যটি বলিয়া ভুল করা অসম্ভব।... রুষ্ট মুখে মিষ্টান্ন দিলে তাহা প্রত্যাহার করা নয়-দশ বৎসরের বালিকার বিরুদ্ধে এতো বড়ো অপরাধ নহে যে তাহা সে ভুলিতেই পারে না।... যাহা হউক, রাণুকে একগুঁয়ে বলিয়া মনে-মনে গালি দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, সে আগে কথা না বলিলে আমিও যাচিয়া কথা বলিতে যাইবো না।

বিনাপণে কন্যার বিবাহ—

যদুগোপাল বাবুর এতোখানি সৌভাগ্যের সংবাদে তাঁর আত্মীয় প্রতিবেশী শুভার্থীদের আহ্লাদে চোখ কপালে উঠিয়া যাওয়া ছাড়া তার আর একটি ফল হইলো ইহাই যে, যাঁহারা কন্যার পিতা তাঁহারা আশা করিতে লাগিলেন, দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে—কন্যার বিবাহের পর তাহাদের আর কৌপীন ধারণ করিতে হইবে না

এই সময় রাণু একদিন আমার সঙ্গে যাচিয়াই কথা কহিলো। কানুদা, তুমি নাকি আমার বিয়েতে পদ্য লিখবে?

দুর্দৈব ঘটিবেই, কাজেই ঠিক মূহূর্তেই আমি প্রীতি-উপহারকে আরও উপদেশ পূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা লাইন কাটিয়া পরিবর্তে নূতন লাইন যোজনা করিতেছিলাম।

কাগজের উপর চোখ রাখিয়াই বলিলাম, — হুঁ।

— কী লিখেছো পড়ো দেখি শুনি।

একটু গর্বিত ভাবেই পড়িলাম।—

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, স্বদেশ, শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজন; দেবর, ননদ, দাস-দাসী, সমগ্র মানবজাতি এবং গৃহপালিত পশু-পক্ষীর প্রতি নারীর কর্তব্য কিছুই আমার পদ্যে বাদ পড়ে নাই; অপরিচিত ও বিরৎসঙ্কুল সংসার-কাননে প্রবেশোদ্যত নবদম্পতির মস্তকে করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষণ করিতে ভগবানকে সানুনয়ে আহ্বান করিয়া প্রীতি-উপহার শেষ করিয়াছি।-

পড়া শেষ করিযা কাগজখানি পরম মমতার সহিত টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিতেছি-এমন সময় রাণু ছোঁ মারিয়া কাগজখানা টানিয়া লইয়া বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলো।... চেঁচাইতে-চেঁচাইতে প্রীতি-উপহারের পশ্চাদ্ধাবান করিয়া যখন রাণুদের বাড়িতে ঢুকিলাম তখন রাণু রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেছে।

হাঁকিয়া বলিলমা, —আমার কাগজ দে।

রাণু আঙুল তুলিয়া রান্নাঘরের ভিতরটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া গেলো।—

রাণুর মা রান্নাঘরের ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, —কীরে কানু?

আমি বলিলাম, — আমি উপহার লিখেছিলাম; রাণু নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

—ওমা, তাই বুঝি জ্বলন্ত উনুনে দিয়ে গেলো। এমন হতভাগা মেয়েও তো জন্মে দেখিনি।—

ক্রন্দন দমন করিতে-করিতে চলিয়া আসিলাম; দুর্জয় ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিলো!—প্রীতি-উপহার নিজের নাম সংবলিত করিয়া ছাপাইয়া বিতরণ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমার আদৌ দুঃখ হইলো না; ক্ষোভে-দুঃখে আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিলো ফসল রচনাটিকে নিষ্প্রয়োজনে সে এমন নৃশংসভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিলো! ... সাত দিনের দিন পদ্যটি খাড়া করিয়াছিলাম, — কতো ছাঁটিয়া কতো বার নকর করিয়া তবে তাহাকে মনের মতো করিয়া তুলিয়াছিলাম... ভাবিতে ভাবিতে কতোবার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে- দিনে দুশোবার পড়িয়াও তৃপ্তি হয় নাই, সেই পদ্য কিনা আগুনে দিয়া পুড়াইল! ... নিজের মাথা হইতে শব্দ বাহির করিয়া ছন্দ মিলাইয়া পদ্য লেখা এই আমার প্রথম— আমার আদিতম মানস-তনয়াকে লইয়া সে এ কী করিলো! তাহাকে জ্বলন্ত উনানে ঠেলিয়া দিয়া পুড়াইলো! ... শোকাগুনে আমি পুড়িতে লাগিলাম।

রোশনচৌকি বাজিতেছে।

আজ রাণুর বিবাহ।

সেদিন রাণুর সঙ্গে রাজৈশ্বর্যের উপমাটা দৈবাৎ মনে আসিয়া ছিলো ...

আজ সেইটাই যেন খচখচ চকরিয়া কোথায় বিঁধিতে লাগিলো একটা আপশোষের মতো।

রাণু ঘোমটা টানিয়া শ্বশুরবাড়ি গেলো; আমি বাক্‌শো-বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিলাম।-

রাণু পিত্রালয়ে আসে, আমিও বাড়ি আসি।...

কিন্তু বলিবার মতো কিছু ঘটে না।...

যেদিন ঘটিলো, সেদিন অপূর্ব অনুভূতপূর্ব একটা অসামান্য অনুভূতির অতিশয় বেগবান হিল্লোলে আমি সহসা পূর্ণ হইয়া গেলাম। শুষ্ক নদী যেমন বন্যার জলে দেখিতে-দেখিতে পূর্ণ হইয়া যায়।... সুপ্তোত্থিত স-বস্ন রতিপতি কখন আসিয়া উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল টের পাই নাই।

সহসা সে সিংহদ্বার খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল— এবং সেই মুহূর্তেই আমার উল্লসিত চোখের সম্মুখে জলস্থল অন্তরীক্ষে একটা লোহিত মায়াঞ্জন ব্যাপ্ত হইয়া গেলো।

রাণু আমাকে দেখিতে পায় নাই

আমিই তাহার জ্বলন্ত রূপ আর দুরন্ত যৌবনের দিকে চাহিয়া ছিলাম, — নেত্রের সেই উন্মত্ত সম্ভোগ জীবনের প্রতিদিনের বস্তু নয়, চোখের পলক পড়িতে চাহে নাই।...

ঘটনা আমাদের বাড়িতেই—

যখন দৈবাৎ একসময়ে তাহার সঙ্গে আমার দৃষ্টির মিলন হইয় গেলো, তখনই রাণু লজ্জিত হইয়া উঠিয়া শশব্যস্ত স্থান ত্যাগ করিয়া গেলো। অন্তরের তৃষ্ণার্ত কলুষ অগ্নি-তরঙ্গের মতো আমার বুক জুড়িয়া গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলো।

রাণুর বয়স এখন চৌদ্দো—

কিন্তু অতুলনীয় প্রচুর স্বাস্থ্যের প্রভাবে সে ঐ বয়সেই কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ-যৌবনের

মধ্যাহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুদিন পরেই রাণুর সঙ্গে দুই বাড়ির যাতায়াতের পথে দেখা হইলো। আমাকে দূর হইতে দেখিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল...

যেন ফিরিয়া যাইবে—

কিন্তু তার বদলে সে আঁচল তুলিয়া মুখ আড়াল করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল!

পাশ দিয়া যাইতে-যাইতে মুখে বলিলাম, আমি কানু।

কিন্তু মনের ভিতর যে কাণ্ড চলিতে লাগিলো তাহার মূর্তি ঝটিকাহত সিন্ধুর মতো—

রাণু বলিলো, - তা জানি। তুমি আমার মুখ দেখবার যোগ্য নও। বলিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলো।

ঘটনার সূত্র ধরিয়া কথার অর্থ ঠিকই বুঝিলাম, কিন্তু বিদ্ধ হইয়া অভিমান করিতে পারিলাম না। ... তাহাকে নূতন চক্ষে দেখিয়া অবধি বুকে যে ঝড় উঠিয়াছিল, ক্রোধ-অভিমানের সাধ্যই ছিলো না তার মধ্যে মাথা তোলে।...

অন্তরলোকের জ্যোতির্মঞ্চের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নিঃসঙ্গ দুটি গ্রহের মতো সে আর আমি।

এতো পরের রাণু জানে না।—

রাণু স্বামীর ঘরে গেলো।

কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন মৃত্যু ক্ষুধিত রাক্ষসের মূর্তিতে দেখা দিয়া নর-নারীগুলিকে যেন দুই হাতে মুখে তুলিয়া অবিরাম গ্রাস করিতে লাগিলো। ক্রন্দনে-হরিধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেলো শব-বাহকের মুখে হরিধ্বনি, পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে হরিধ্বনি, দলবদ্ধ লোকের মুখে হরিধ্বনি... কিন্তু হরিঠাকুর ভয়ার্ত জীবিতের আকুল আহ্বানে কর্ণপাতও করিলেন না —

লোক মরিতেই লাগিলো।

মহামারী আরম্ভ হইবার সম্পত দিনে রাণুর পিতা ও মাতা মাত্র বারো ঘণ্টার ব্যবধানে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

রাণুকে দুঃসংবাদটা দিয়া আমরা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম।

দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি।

ছয়মাসে শ্মশান আবার লোকালয়ের আকার ধারণ করিয়াছে।

বাবা রাণুকে তাহাদের ঘর-বাড়ির একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিলেন।

রাণু লিখিলো, 'বাড়ি বেচিয়া ফেলুন।'

সেইদিন আমিও একখানা পত্র পাইলাম; দেখিয়াই চিনিলাম, ঠিকানা লেখা রাণুর। লিখিয়াছে-

'কানুদা, তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না, জীবনে ইহাই আমার সকল দুঃখের বড়ো দুঃখ।

দুটি দিনের কথা তোমার মনে পড়ে? ... যেদিন রাগ করিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া খাবার খাও নাই, আর যেদিন তোমার প্রীতি উপহারের কাগজ আগুনে ফেলিয়া দিয়াছিলাম? কারণ কী, তুমি নিশ্চয়ই জানো না। শুধু এইটুকু জানিয়া রাখো, তোমার সে-উল্লাস আমার সহ্য হয় নাই। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্রাণী; আমার প্রণাম গ্রহণ করো। ইতি রাণু।

Pathagar.net

রাণুর পত্র পড়িয়া শূন্যের দিকে চাহিয়া আমার দৃষ্টি নিষ্পলক হইয়া গিয়াছিলো— অবাক মন দিশা পায় নাই। কিন্তু অদৃষ্টে ছিলো রাণুর সঙ্গে আবার দেখা হইবে।

রাণুর স্বামী বদলি হইয়া আমাদের দেশে রাণুরই হস্তান্তরিত বাড়িতে ভাড়াটে হইয়া আসিলো।

রাণু প্রথমটা কান্নাকাটি করিয়া আমার স্ত্রীর সখিত্বে সুস্থির হইলে দেখিলাম, রাণু ইন্দিরাকে একান্ত সন্নিকটে টানিয়া লইয়া আমাকে তার রাজ্য হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে।

আশা করিয়াছিলাম, অন্তত পক্ষে কানুদা বলিয়া ডাক দিয়া রাণু আমার পায়ের ধুলা লইয়া যাইবে; কিন্তু আসিলো না।

ইন্দিরা বলিলো, — রাণুর ছেলেটি বড়ো সুন্দর হয়েছে।

— হবার তো কথা ; ওরা দুজনেই সুন্দর ।

— ছেলেটাকে আমায় দেবে বলেছে।

ইন্দিরার পক্ষে হইতে ছেলে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, চেয়েছিলি বুঝি?

— না না চাইবো কেন! সেই-বললে, বউ আমার ছেলেটা তুই নে।

— বেশ দয়ালু তো!

হঠাৎ ইন্দিবা লাল হইয়া উঠিলো। তাহার এই চমৎকার লজ্জা দেখিয়াই মনে পড়িয়া গেলো, আমার শেষ কথাটার অর্থ বহুদূর যায়। পুত্রবতী হইবার আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া না বসিলে রাণুর দানে দয়ার কথাটা আসে না। কিন্তু ইন্দিরার বয়স সবে পনেরো। জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলের নাম কি?

— বেণু।

মনে মনে আবৃত্তি করিলাম, কামু বেণু। কেন জানি না, ছেলের মান বেণু রাখা, এবং ব্যাপার বেনামিতে নিষ্পন্ন করিয়া তাহাকে আমার ক্রোড়ে অর্পণ করিবার অসত্য প্রস্তাবের একটা গভীর নিহিত অর্থ ও অভিসন্ধি যেন ধীরে -ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিলো।

হয়তো আমার কল্পনা অমূলক—

হয়তো চিন্তা ও ইচ্ছা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য—

কিন্তু ভ্রান্তির মাঝে জন্মলাভ করিয়াই হর্ষের যে-কম্পন প্রাণের উপর দিয়া শিরশির করিয়া বহিয়া গেলো তাহা পরম তৃপ্তির সঙ্গেই উপভোগ করিলাম; সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে কোথাও টান পড়িলো না।—

বেণুর মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দিরা বলিলো, দুটি দাঁত উঠেছে মুক্তোর মতো। নেবে কোলে?

দাও। বলিয়া হাত বাড়াইতেই বেণু নির্বিবাদে আমার কোলে আসিলো।

ইন্দিরা হাসিয়া বলিলো, -বেশ আলাপি।

কথাটা কানে গেলো, কিন্তু মন তখন অন্যদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহারই অঙ্গবিচ্যুত এই শিশু

তাহারই সুনিবিড় আকঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির এই বিগ্রহ—

তাহারই প্রাণের স্পন্দন দেহের বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত রক্ত, হৃদয়ের আনন্দ-রস স্থানান্তরিত হইয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছে।

মুখ তুলিয়া দেখিলাম, ইন্দিরা বেণুর দিকে অত্যন্ত লালসার চক্ষে চাহিয়া আছে; আমি চোখ তুলিতেই ইন্দিরা একটু হাসিয়া সরিয়া গেলো, — আমারও চক্ষে লালসা ছিলো, কিন্তু দুটিতে এমনি অমিল যেন হাসি আর কান্না।

বেণুর চোখের দিকে চাহিলাম...

ঠিক তেমনি চক্ষু দুটি; কোথায় প্রভেদ কোথায় নয়; মিল অমিলের কোথায় সন্ধিস্থল সে-বিশ্লেষণ নিমেষেই অতিক্রম করিয়া আমার দৃষ্টি সেই দৃষ্টির নীল পারাবারে ডুবিয়া গেলো।

সহসা মনে হইলো, আমি যেন অপূর্ণ; জীবনের অর্ধাংশ বিচ্ছিন্ন কক্ষচ্যুত হইয়া আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে... সর্বত্রই ঐক্য, শান্তি; কেবল কী হইলে কী হইতো ইহারই একটা অস্থির উত্তপ্ত কল্পনা আমার একটা দিক যেমন শুষ্ক বেদনাময় করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে একটা দুরু দুরু শঙ্কারও লেশ, নাই-পাছে এই বেদনা অসাড় হইয়া একদিন মনে নিরাশার লোল স্থবিরত্ব আসিয়া যায়!...

ইন্দিরা আসিয়া অস্থির হইয়া গেল— ছেলে কোলে করার রকম ঐ নাকি?

বেণুকে তাহার হাতে দিয়া তুলিয়া বলিলাম, —এরকম দুরন্ত হ'য়ে আসবে; যতোদিন তা না হয় ততোদিন পরের ছেলে একটু অসুবিধা ভোগ করলোই বা।

একটা ধমক খাইলাম।

... আমার অন্তর্গূঢ় সুখের শত্রু হইয়া উঠিলো, ঈর্ষা। থাকিয়া থাকিয়া বুক টনটন করিয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে, আমার নিজেরই বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতার বিতরদিয়ো একটা ছবি

রাণু পরস্ত্রী-

-- এই জ্ঞানটা অনায়াস মুখ-সমাদরের সঙ্গে মনে-মনে লালন করিবার বস্তু নয়। অনিবার্য অঙ্কুশ-তাড়না যেন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে চায়।

ইন্দিরা একটা নূতন খবর দিলো, — রাণুটা একটু পাগল!

— মানে?

—বলে, আয় বৌ, তুই আর আমি এক ঘরে যাই।

— পাগলের লক্ষণই বটে। তুমি কী বললে?

জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দিরা কী একটা উত্তরও দিলো কিন্তু ইন্দিরা তখন তাহার শব্দা-স্পর্শ লইয়া আমার সম্মুখ হইতে একেবারে মুছিয়া গেছে...

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চকর কণ্টকোৎসব জাগাইয়া আনন্দের সুতীব্র শিখা আমার স্নায়ু-শিরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।...

কতক্ষণ এই উদ্বেলিত আনন্দে মুহ্যমান হইয়াছিলাম, কী করিয়াছিলাম জানি না। হুঁশ ফিরিলে দেখিলাম ইন্দিরা অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। একটু হাসির আমদানি করিয়া বলিলাম, কি বলছিলাম যেন?

ইন্দিরা বলিলো, — তুমি কিছু বলছিলে না, আমিই বলছিলাম যে- বলিয়া হঠাৎ থামিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইলো।

ইন্দিরার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'উঠলে যে? হঠাৎ রাগ হলো কিসে?

রাগ হয়নি, কিন্তু তোমার মতো অনামনস্ক লোকের সঙ্গে কথা বলাই বালাই।

-- আচ্ছা, এবারকার মতো মাপ করো। রাণু পাগলের মতো কী কথা কয়েছে, তুমি তাতে কী বললে?

ইন্দিরা সমগ্র ব্যাপারটা কী ভাবে গ্রহণ করিলো সে-ই জানে, সহজ কণ্ঠেই বলিলো, 'আমি বললাম, পারো হও। কিন্তু একজনকে তাহ'লে বৌ খোয়াতে হবে।' রাণু বললে, 'কানুদাকে জিগগেশ করিস সে খোয়াতে রাজি আছে কিনা।'

— মোটেই না।' বলিয়া ইন্দিরাকে আলিঙ্গন করিতে হাত উঠি-উঠি করিয়াই থামিয়া গেলো। বলিলাম, 'বসন্তবাবুর সঙ্গে একটা আপোশ করে নিতে পারলে একরকম বন্দোবস্ত করা যায়।'

কিন্তু হঠাৎ ইন্দিরার উৎসাহ যেন মরিয়া গেলো।

ছ-মাশ কাটিয়াছে।

টেলিগ্রামে বসন্তবাবুর বদলির খবর আসিয়াছে।

রাণুর সঙ্গে এতোদিন মুখোমুখী দেখা হয় নাই। আমাদের বাড়িতে সে আসে নাই।

ইন্দিরাকে বলিয়াছে, 'বড়ো ঝামেলা, ভাই; গল্প জমে না!'

ইন্দিরাকে সে ডাকিয়া লইয়াছে।

যাইবার আগের দিন রাণু আমাদের বাড়িতে আসিলো। ছেলেটিকে ইন্দিরার কোলে দিয়া আমার পায়ের কাছে একটা প্রণাম রাখিয়া কহিলো, 'কানুদা কাল আমরা যাবো। তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। বৌটি বড়ো ভালো মানুষ।'

আমি বলিলাম, — 'ভালমানুষ বৈ কি।' বলিয়া রাণুর দিকে চাহিয়া হাসিবো কি ইন্দিরার দিকে চাহিয়া হাসিবো তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আইনের পুস্তকের দিকে চাহিয়াই একটু হাসিলাম।

— রাজি তো?'

নিজেরই চমকানো দেখিয়া বুঝিলাম অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম।

'কিসে?'

ইন্দিরা বলিলো — 'ঐ রকমই, কথায়-কথায় অন্যমনস্ক।'

রাণু বলিলো, — ঐ যে বললাম, বৌ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। আর তো দেখা হবে না।'

কণ্ঠস্বর গাঢ় শুনাইলো।

বলিলাম, 'আচ্ছা।'

ইন্দিরা বলিলো, 'যা বলেছি ঠিক তাই।'

— কী?'

— রাণুটা একটা পাগল।'

— 'আবার কী বললে?'

ইন্দিরা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলো, — 'কে জানতো।'

বলিয়া থামিয়া খুব হাসিতে লাগিলো।

আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইন্দিরার হাসি থামিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, — 'কথাটা কী?'

ইন্দিরা বলিলো, — 'যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গেলাম।—

ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক্ রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে। আমি তৃপ্ত

boiRboi.net

কৃষ্ণকুমারী নাটক।

৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রযোগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্য প্রত্যয়ং চেতঃ॥

কালিদাস।

চতুর্থবার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শ্রীঅকশোদয় ঘোষ দ্বারা অপরচিৎপুররোড, শোভাবাজার
২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্নযন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮২ সাল।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণজনগণকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাতকরা যাইতেছে, যে মৃত মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সটীক মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বুড়সালিকের ঘাড়ে রোঁ, ...ছি। একেই কি বলে সভ্যতা? ইত্যাদি পুস্তক সমুদয়ের গ্রন্থস্বত্ব দোষ অন্যান্য যাবতীয় স্বত্ব আমি মেসর্স মেকিঞ্জি লায়েল শে- কোম্পানীর ১৮৭৪ সালের ২৩এ, সেপ্টেম্বর তারিখের প্রকাশ্য নীলামে ক্রয় করিয়াছি। ঐক্ষণে ঐ সকল পুস্তক আমার এক আমার উত্তরাধিকারিগণের স্বত্ব হইয়াছে; অতএব যিনি উল্লিখিত পুস্তক সমুদয় আমার কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিগণের বিনানুমতিতে মুদ্রিত কি প্রকাশিত কিম্বা কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া অন্য পুস্তকে সংযোজিত করতঃ প্রকাশ করিবেন, তিনি গ্রন্থস্বত্বের আইনানুসারে দণ্ডার্হ এবং ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবেন।

শ্রীরাজকিশোর দে।

কলিকাতা;
২৩এ, সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ সাল।

...দ্য রচনা ... ব্রত
... উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমি-

মঙ্গলাচরণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়,
মহাশয়েষু।

মহাশয়!

আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নট-কুল-শিরোমণি; ইহার দোষ গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ, আমার এই বাঞ্ছা, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিতসম্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ এক জন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিতেন।

আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, দর্শনকাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কত দূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি, যে মৃত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অন্যান্য মহাশয়েরা যত্নবান্ হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় আমাকে যে কত দূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না, যে আর এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ করিলেন?

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমি-

ত্রাক্ষর পদ্য এখনও এ দেশে এত দূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্ব্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। অপিচ ইহাও বক্তব্য, যে আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি, অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, এ অভিনব কাব্য আপনার এবং অন্যান্য গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে আদরণীয় হইলে, পরিশ্রম সফল বোধ করিব, ইতি।

গ্রন্থকারস্য

নিবেদনমিতি।

কৃষ্ণকুমারী নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জয়পুর—রাজগৃহ।

(রাজা জয়সিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। আঃ কি আপদ্! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিশ্রাম কর্ত্তে দেবে না? তুমিই যা হয় একটা বিবেচনা কর গে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, অনন্তদেবই পৃথিবীর ভার সর্ব্বদা সহ্য করেন। তা আপনি এতে বিরক্ত হবেন না।

রাজা। হা! হা! মন্ত্রীবর, অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষুদ্রমনুষ্য মাত্র। আহার, নিদ্রা, সময় বিশেষে আরাম—এসকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা দুষ্কর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচ্যে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি? যবনদল কিম্বা মহারাষ্ট্রের সৈন্য ত এই মুহূর্ত্তেই এ নগর আক্রমণ কত্যে আস্‌চে না——

(ধনদাসের প্রবেশ।)

আরে, ধনদাস ? এস, এস, তবে ভাল আছ ত ?

ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদাস। আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে এর কি অমঙ্গল আছে ?

মন্ত্রী। (স্বগত) সব প্রতুল হলো—আর কি ? একে মনসা তায় আবার ধুনার গন্ধ! এ কর্ম্মনাশাটা থাক্‌তে দেখ্‌ছি কোন কর্ম্মই হবে না। দূর হোক্! এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পণ্ড পরিশ্রম।

[প্রস্থান।

রাজা। তবে সংবাদ কি, বল দেখি ?

ধন। (সহাস্য বদনে) মহারাজ, এ নিকুঞ্জবনের প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান করা হয়েছে, সুতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা, ধুতুরা প্রভৃতি গোটা কতক কদর্য্য ফুল বাকি আছে। কৈ ? জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটীও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে ? সাগর বারিশূন্য হলো না কি ?

ধন। আর, মহারাজ! এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষ্‌তে লাগ্‌লে, সাগরে কি আর বারি থাকে ?

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি ?

ধন। আজ্ঞা, তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা ত নয়, সাতটা সাগর আছে !

রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় ... হয়ে উঠ্‌লো। তবে এখন উপায় কি, বল দেখি ?

ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন কর্‌চি। আপ... অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এ... একবার আপনাকে দেখাবার নিমিত্তেই আমি এখানে ...লেম।

রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ, এ কার প্রতিমূর্ত্তি হে? এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই।

ধন। মহারাজ, আপনি কেন? এমন রূপ, বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে নাই।

রাজা। তাই ত! আহা! কি চমৎকার রূপ! ওহে ধনদাস, এ কমলিনীটী কোন্ সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বল্‌তে পার? তা হলে আমি বায়ুগতিতে এখনই এর নিকটে যাই।

ধন। মহারাজ, এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে কি হবে? এ বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে। এর চারিদিকে রুদ্রচক্র অহর্নিশি ঘুর্‌ছে। একটী ক্ষুদ্র মাচীও এর নিকটে যেতে পারে না।

রাজা। কেন? বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি শুনি?

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ——

রাজা। বলই না কেন? তায় দোষ কি?

ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজদুহিতা——এঁর নাম কৃষ্ণকুমারী!

রাজা। (সসম্ভ্রমে) বটে? (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বল্‌ছিলে এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্ম গ্রহণ করেছেন; যে বংশের যশঃসৌরভে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, দেখ, ধনদাস——

ধন। আজ্ঞা করুন।

রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্‌পা রায়ের যথার্থ নাম কি, তা জান ত?

রাজা। এই নাও। (পত্রদান।)

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতাকর্ণ!

রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান কল্লে, এতে তোমার কাছে আমি চিরবাধিত থাক্‌লেম।

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাস মাত্র! দেখুন মহারাজ, আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রীরত্নটী লাভ হয়।

রাজা। (উঠিয়া) বল কি, ধনদাস? আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে?

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌বামাত্রেই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ বংশে অনেকবার বিবাহ করেছেন; আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্ব্ব প্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। যেমন পঞ্চালদেশের ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁর কৃষ্ণাকে পৌরবকুলতিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুন্‌লে মহারাজ ভীমসেনও সেইরূপ হবেন।

রাজা। হাঁ—উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে; কিন্তু মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত অভিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাক্‌বে না।

ধন। মহারাজ, আপনি সূর্য্যবংশ চূড়ামণি! মহোদয় ব্যক্তিরা আপ্‌নাদের গুণবিষয়ে প্রায়ই আত্মবিস্মৃত। এই জন্যে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন না। জনকরাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন?

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—তুমি একবার মন্ত্রীবরকে ডাক দেখি।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়। এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে। (উপবেশন।)

(মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃ প্রবেশ।)

মন্ত্রী। দেব, অনুমতি হয় ত, এ পত্র কখানি রাজসম্মুখে পাঠ করি।

রাজা। (সহাস্য বদনে) না, না! ও সব সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন কথা আছে।

মন্ত্রী। (বসিয়া) আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ, মন্ত্রীবর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান সন্ততি আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ আছে।

রাজা। কয় পুত্র, কয় কন্যা, তা তুমি জান?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীর্ব্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে।

ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম সুন্দরী?

মন্ত্রী। লোকে বলে যে যাজ্ঞসেনী স্বয়ং পুনরায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হয়েছেন!

ধন। তবে, মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমারীর বিবাহের চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নরনারায়ণ অবতার!

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তবে কি না এতে যৎকিঞ্চিৎ বাধা আছে।

রাজা। কি বাধা?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, সে দেশের বর্ত্তমান নরপতি মানসিংহ নাকি এই কন্যার পাণিগ্রহণ কর্ত্তে ইচ্ছা করেন।

রাজা। বটে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দত্তক পুত্র এ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ কর্ত্তে চায়? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র? দেখ, মন্ত্রি, তুমি এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও! আমি এ রাজকন্যাকে বরণ করবো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়া ক্ষান্ত পাব না!

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, এ কি ঘরাও বিবাদের সময়? দেখুন, দেশ-বৈরীদল চতুর্দ্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে।

রাজা। আঃ, দেশবৈরীদল! তুমি যে দেশবৈরীদলের কথা ভেবে ভেবে একবারে বাতুল হলে! এক যে দিল্লীর সম্রাট, তিনি ত এখন বিষহীন ফণী। আর যদি অহারাষ্ট্রের রাজার কথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভী। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ। তা যাও। তুমি এখন যথাবিধি দূত প্রেরণ কর গে। মানসিংহের কি সাধ্য যে সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে?

ধন। (জনান্তিকে) মাহারাজ, এ দাসকে পাঠালে ভাল হয়না?

রাজা। (জনান্তিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি একজন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়, তোমার যাওয়ায় হানি কি? (প্রকাশে) দেখ, মন্ত্রি, তুমি ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠায়ে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়,

আপনি তবে আমার সঙ্গে আসুন। এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য সেটা স্থির করা যাক্‌গে।

রাজা। যাও, ধনদাস, যাও।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা, এমন মহার্হ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে? তা দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত সুচতুর মানুষ; ও যদি সুচারুরূপে এ কর্ম্মটা নির্ব্বাহ কত্যে না পারে, তবে আর কে পার্‌বে?

(ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ।)

ধন। মহারাজ,—

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে?

ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথার ঐক্য হচ্যে না। তারই জন্যে আবার রাজসম্মুখে এলেম্।

রাজা। কি কথা?

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে নিলে ভাল হয়; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্যে গেলে অনেক অর্থের ব্যয় হবে!

রাজা। হা! হা! হা! বৃদ্ধ হলে লোকের এমনি বুদ্ধিই ঘটে! তবে মন্ত্রীর কি ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও?

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

রাজা। কি লজ্জার কথা! একেত মহারাজ ভীমসেন অত্যন্ত অভিমানী, তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ত্রুটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠ্‌বে।

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এ দাসও তাই বল্‌ছিল।

রাজা। আচ্ছা—তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি

তোমার সঙ্গে একশত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী, আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে কৃপণতা কল্যে কায হবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধেও স্বয়ং বৃহস্পতি অবতার! বিবেচনা করে দেখুন দেখি যখন সুরপতি বাসব সাগর মন্থন কর্য্যে অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন, তখন কি তিনি সে বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?

রাজা। দেখ, ধনদাস,—

ধন। আজ্ঞা করুন—

রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তীর নিকটে দূত করে পাঠিয়ে ছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখো, ধনদাস, আমার কর্ম্ম যেন নিষ্ফল না হয়।

ধন। মহারাজ, আপনার কর্ম্ম সাধন কত্যে যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত; কিন্তু রাজচরণে আমার একটী নিবেদন আছে।

রাজা। কি?

ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দূত করে পাঠিয়ে ছিলেন, তার সোণার পাখা ছিল; এ দাসের কি আছে, মহারাজ?

রাজা। (সহাস্য বদনে) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটী গ্রহণ কর।

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতাকর্ণ!

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অদ্যই যাতে যাত্রা করা হয়, এমন উদ্যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি এখন বিলাসকাননে গমন করি।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন কর।

আমার যা কর্ম্ম তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নয়। কোথায় উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা হলো; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ কর্‌লেম! এ কি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম! হা! হা! হা! বিশসহস্র মুদ্রা! হা! হা! হা! মধ্যে থেকে আবার এই অঙ্গুরীটীও লাভ হয়ে গেল! (অবলোকন করিয়া) আহা! কি চমৎকার মণি খানি! আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূল্য মণি কখন দেখেন নাই! যা হোক্, ধন্য ধনদাস! কি কৌশলই শিখেছিলে! জ্যোতির্বেত্তারা বলে থাকেন্ যে গ্রহদল রবিদেবের সেবা কর্য্যে তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন; আমরাও রাজ-অনুচর; তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে কর্‌বো? তা এইত চাই! আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে! কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয়; কখন বা অহেতু দোষারোপ কত্যে হয়; কারো বা দুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখ্‌তে হয় আর কাক কাক মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয়; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন কর্য্যে হোক্, আপনার কার্য্য উদ্ধার করা চাই! তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মানুষ? হুঁঃ! তার মন ত বেশ্যার দ্বার বল্যেই হয়! কোন আবরণ নাই। যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কত্যে পারে! এরূপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে——পরকাল কি? পরকালে বাপ নির্ব্বংশ——আর কি! হা! হা! যাই, অগ্রে ত টাকা গুলো হাত করিগে; পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ সেটা আবার এক বিষম কণ্টক! ভাল, দেখা যাক, মন্ত্রীভায়ার কত বুদ্ধি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ।

(বিলাসবতী।)

বিলা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কচ্যেন, এর কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অনুরাগিণী হলেম কেন? এ নব-যৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস কর্‌বো, মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার দাসী হলেম যে! আমি কি পাখীর মতন আহারের অন্বেষণে জালে পড়্‌লেম? তা না হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত চঞ্চল হয় কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস) রাজার আস্‌বার ত সময় হয়েছে; আমাকে আজ্ কেমন দেখাচ্যে কে জানে? (দর্পণের নিকট অবস্থিতি)।

(মদনিকার প্রবেশ।)

(প্রকাশে) ও লো মদনিকে, একবার দেখ্‌ত, ভাই, আমার মুখ খানা আজ আরসিতে কেমন দেখাচ্যে?

মদ। আহা, ভাই, যেন একটী কনকপদ্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে! তা ও সব মরুক গে যাক্! এখন আমি যে কথা বল্‌তে এলেম, তা আগে মন দিয়ে শোন।

বিলা। কি, ভাই? মহারাজ বুঝি আস্‌চেন?

মদ। আর মহারাজ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে আস্‌বেন?

বিলা। কেন? কেন? সে কি কথা? কি হয়েছে, শুনি—

মদ। আর শুন্‌বে কি? ঐ যে ধনদাস দেখ্‌চো, ওকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ও পোড়ারমুখোর মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর দুটি আছে?

বিলা। কেন? সে কি করেছে?

মদ। কি আর করবে? তুমি যতদিন তার উপকার করেছিলে, ততদিন সে তোমার ছিল; এখন সে অন্যপথ ভাব্‌চে।

বিলা। বলিস্ কি লো? আমি ত তোর কথা কিছুই বুঝ্‌তে পাল্যেম্ না।

মদ। বুঝবে আর কি? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের নাম শুনেছ?

বিলা। শুন্‌বো না কেন? তিনি ইন্দুকুলের চূড়ামণি; তাঁর নাম কে না শুনেছে?

মদ। তোমার প্রিয়বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে!

বিলা। এ কথা তোকে কে বল্‌লে?

মদ। কেন? এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, একথা সকলেই জানে! ধনদাস যে স্বয়ং কাল সকালে পত্র কত্যে উদয়পুরে যাত্রা কর্‌বে। ও কি ও? তুমি যে কাঁদতে বস্‌লে? ছি! ছি! একথা শুনে কি কাঁদতে হয়? মহারাজ ত আর তোমার স্বামী নন্, যে তোমার সতীনের ভয় হলো?

বিলা। যা, তুই এখন যা—(রোদন)।

মদ। ওমা! একি? তোমার চক্ষের জল যে আর থাকে না! কি আপদ্। আমি যদি, ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই?—ঐ যে ধনদাস এ দিকে আস্‌চে। দেখ, ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ কত্যে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর্। কেবল চক্ষের জল ফেল্‌লে কি হবে? তোমার চক্ষের জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে?

বিলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই। ঐ ধনদাস আস্‌চে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে?

(অন্তরালে অবস্থিতি)।

(ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (স্বগত) হা! হা! মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন; কিন্তু এমনি কৌশলটী কর্‌লেম্ যে ভায়ার আমার মতেই শেষ মত দিতে হলো! হা! হা! রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাঁদে সকলকেই পড়তে হয়! শর্ম্মা আপন কর্ম্মটী ভোলেন না! এইত আপাততঃ সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্যে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, সেটা হাত কর্‌ত্যে হবে; আর পথের মধ্যে যে খানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অনুরাগটী ছিল, তার ত দিন দিন হ্রাস হয়ে আস্‌চে। এখন আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর কোন উপকার হতে পারে না। তবে কি না—স্ত্রীলোকটা পরমসুন্দরী। ভাল—তা একবার দেখাই যাক্ না কেন? (প্রকাশে) কৈ হে? বিলাসবতী কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না?

(বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ।)

বিলা। কি হে, ধনদাস? তবে কি ভাবছিলে, বলদেখি শুনি?

ধন। আর কি ভাব্‌বো, ভাই? তোমার অপরূপ রূপের কথাই ভাবছিলেম্!

বিলা। আমার অপরূপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি?

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার এই চক্ষুদুটীই শিখিয়ে দিয়েছে।

বিলা। বেশ! বেশ! ওহে ধনদাস, তুমি যে একজন পরম রসিক পুরুষ হয়ে পড়্‌লে হে?

ধন। আর ভাই, না হয়ে করি কি? দেখ, গৌরীর চরণ

স্পর্শে একটা পাষাণ মহারত্নের শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমারই দাস!

বিলা। ভাল ধনদাস, তুমি নাকি মহারাজের কাছে একখানা চিত্রপট বিশ হাজার টাকায় বিক্রী করেছ?

ধন। অ্যাঁ—তা—না! এ—একথা তোমাকে কে বল্‌লে?

বিলা। যে বলুক না কেন? একথাটা সত্য ত?

ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে বল্‌লে? তুমিও যেমন ভাই! আজ কাল্ বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে?

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ অঙ্গুরীটী কোথায় পেলে?

ধন। (স্বগত) আঃ, এ মাগীত ভারি জ্বলাতে আরম্ভ কল্যে হে? (প্রকাশে) এ অঙ্গুরীটী মহারাজ আমাকে রাখ্‌তে দিয়েছেন।

বিলা। বটে? তাই ত বলি! ভাল, ধনদাস, মরুভূমি আকাশের জল পেলে যেমন যত্নে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে তেমনি যত্নে রাখ না?

ধন। কে জানে, ভাই? তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনা।

বিলা। না—তা পারবে কেন? তোমার মতন সরল লোক ত আর দুটী নাই। আমি বল্‌ছিলেম কি, যে মরুভূমি যেমন জল পাবামাত্রেই তাকে একবারে শুষে নেয়, তুমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি পেলে ত তাই কর? সে যাক্ মেনে; এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নাকি উদয়পুরের রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো?

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ বাঘিনী আবার এ সব কথা কেমন করে শুনলে?

বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে চুপ্‌করে রই-লেন ?

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বল্‌লে বল ত ?

বিলা। মিছে কথা বৈ কি ? আমি তোমার ধূর্ত্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি ; তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর আমাকে যে সব কথা বলেছ, সে সব মহা-রাজ শুন্‌লে, তোমাকে উদয়পুরে ঘটকালি কত্তে না পাঠিয়ে, একবারে যমপুরে পাঠাতেন ! তা তুমি জান ?

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত ? তোমার দোষ কি, ভাই ? এ কালের ধর্ম্ম ! এ কলিকাল কি না ? এ কালে যার উপকার কর, সে আবার অপকার করে ! মনে করে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছ ! এখন যে তুমি এই রাজ-ইন্দ্রা-ণীর সুখভোগ কচ্চো, সেটি কার প্রসাদে ? তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন ? তুমি যদি আমার অপবাদ না করবে, ত আর কে করবে ? তুমিও ত একজন কলিকালের মেয়ে কি না।

বিলা। হাঁ—আমি কলিকালের মেয়ে বটি ; কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি অবতার। তুমি আমাকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ কর্‌য়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব কথা তুমি আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি। তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌লে ? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্ম্মপথে ছিলেম। এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, কোন্‌ দুষ্ট বেদে এ পাখীটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোণার পিঞ্জরে রেখেচে ? (রোদন।)

ধন। (স্বগত) এ মেয়ে মানুষটীকে আর কিছু বলা ভাল হয় না ; এ যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুন্‌লে আর নিস্তার থাক্‌বে না। (প্রকাশে) আমি ত ভাই তোমার হিত বৈ অহিত কখন করি নাই ; তা তুমি আমার উপর এ বৃথা রাগ কর কেন ?

বিলা। এ বিবাহের কথা তবে কে তুল্লে ?

ধন। তা আমি কেমন করে জানবো ?

বিলা। কেমন করে জানবে ? তুমি হচ্চো এর ঘটক, তুমি জানবে না ত আর কে জানবে ?

ধন। হা! হা! তোমাদের মেয়েমানুষের এমনি বুদ্ধিই বটে! আরে আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্যে বৈ ত নয়! তুমি কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে ? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক! তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু।

নেপথ্যে। ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন ? মহারাজ তাঁকে একবার ডাক্‌চেন।

ধন। ঐ শোন! আমি ভাই, এখন বিদায় হই। তুমি এ বিষয়ে কোনমতেই ভাবিত হইও না। যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নবযৌবন আর রূপ, এ ধনপতির ভাণ্ডার! (স্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও; আমি ত এই তোমার মাথা খেতে চল্‌লেম!

[প্রস্থান।

বিলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ও স্বগত) এখন কি যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বলা যায় না! কৈ ? মহারাজ ত আজ আর এলেন না।

(মদনিকার পুনঃপ্রবেশ।)

মদ। কেমন, ভাই ? আমি যা বলেছিলেম, তা সত্য কি না ? তবে এখন এর উপায় কি ? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জন্যে গেলে।

বিলা। আর উপায় কি ?

মদ। উপায় আছে বৈ কি? ভাবনা কি? ধনদাস ভাবে যে ওর মতন সুচতুর মানুষ আর দুটী নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও দুষ্টকে ঠকান বড় কথা নয়।

বিলা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর—রাজগৃহ।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ।)

অহ। ভগবতি, আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে বৈ ত নয়! আহা! মহারাজের মুখ খানি দেখ্‌লে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের প্রতি একবারে এত বাম হলেন!

তপ। রাজমহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত! লোকে যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল সুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক সাগরপথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্ব্বদাই শান্তবায়ু সহযোগে যায়। কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময় বিশেষে যে তাদের গতি রোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে, যে সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপনি যদি আমাদের দুরবস্থার কথা শোনেন, তা হল্যে——

তপ। দেবি, আমি চির-উদাসিনী। এ ভবসাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ কত্যে পারে না! তবে যে——

অহ। (অতি কাতরভাবে) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখ্‌লে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না! আহা! সে সোণার

শরীর একবারে যেন কালি হয়ে গেছে! বিধাতার একি সামান্য বিড়ম্বনা!

তপ। মহিষি, সুবর্ণকান্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়! তা আপনাদের এ দুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হ্রাস কর্‌বে না! দেখুন, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না সহ্য করেছিলেন!

অহ। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন বনবাস করা ভাল! রাজপদ যদি সুখদায়ক হতো, তা হলে কি আর ধর্ম্মরাজ, রাজ্যত্যাগ করে্য মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন।

তপ। হাঁ—তা সত্য বটে। ভাল, রাজমহিষি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির করেছেন, বলুন দেখি?

অহ। আর কি স্থির কর্‌বো? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি।

তপ। সে কি মহিষি? এ কর্ম্মে অবহেলা করা ত কোন মতেই উচিত হয় না। সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত; তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন? ————ঐনা মহারাজ এইদিকে আস্‌চেন?

অহ। ভগবতি, একবার মহারাজের মুখপানে চেয়ে দেখুন! হে বিধাতঃ, এ হিন্দুকুলসূর্য্যকে তুমি এ রাহুগ্রাস হতে কবে মুক্ত কর্‌বে? হায়, এ কি প্রাণে সয়! (রোদন।)

তপ। দেবি, শান্ত হউন! আপনার এ সময়ে এত চঞ্চলা হওয়া উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখ্‌লে যে কতদূর ক্ষুণ্ণ হবেন, তা আপনিই বিবেচনা করুন!

অহ। ভগবতি, মহারাজের এ দশা দেখ্‌লে কি আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছা হয়! হে বিধাতঃ, আমি কোন্ জন্মে কি পাপ করেছিলাম, যে তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে? (রোদন।)

তপ। (স্বগত) আহা! পতির দুঃখ দেখে পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হতে পারে? (প্রকাশে) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাঁড়ান, পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বেন। (হস্ত ধরিয়া) আসুন, আমরা দুজনেই একবার সরে দাঁড়াই গে। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(ভৃত্যসহিত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। রামপ্রসাদ!—

ভৃত্য। মহারাজ!

রাজা। এই পত্র কখানা সত্যদাসকে দে আয়। আর দেখ্ তাঁকে বলিস্, যে এ সকলের উত্তর যেন আজিই পাঠিয়ে দেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। উত্তরের মর্ম্ম যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে!

তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, চিরজীবী হউন!

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, বহুদিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তার আর কি বলবো? রাজমহিষী কোথায়? তাঁকে যে এখানে দেখ্‌চি নে?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, আবার এখনি আস্‌বেন।

রাজা। ভগবতি, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন ?

তপ। আজ্ঞা—আমি তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল ত ?

রাজা। এই যেমন দেখ্‌ছেন। ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাক্‌বেন কি না, তা বলা দুষ্কর।

তপ। মহারাজ, এমন কথা কি বল্‌তে আছে ? মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন ; কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাযুগ অবধি অবস্থিতি কচ্যেন। শরৎকালের শশীর ন্যায় বিপদ্‌মেঘ হতে পুনঃপুনঃমুক্তা হয়ে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন শ্রীভ্রষ্ট হতে পারে ? আপনি এমন কথা মনেও কর্‌বেন না।

(অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ।)

আসুন, মহিষী আসুন।

অহ। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ, এত দিনের পর যে এক বার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য।

রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে অত্যন্ত লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি ? আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত দোষে দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে বসো। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন।)

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

ভৃত্য। ধর্ম্মবতার, মন্ত্রী মহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা। কৈ ? দেখি। (পত্রপাঠ করিয়া) আঃ, এতদিনের পর, বোধ হয়, এ রাজ্য কিছুকালের জন্যে নিরাপদ্ হলো।

(ভৃত্যের প্রস্থান।

অহ। নাথ, এ কি প্রকারে হলো?

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি, এ সংবাদে রাজা দুর্য্যোধনের মতন আমার হর্ষবিষাদ হলো। শত্রুবল স্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্যে, সে কথাটি মনে হলে আমার আর এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণধারণ কত্যে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধের, আমাকে একজন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্যরক্ষা কত্যে হলো? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত আছেন। দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিষ্ঠির বিরাটরাজার সভাসদ্‌পদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন করেন। এই সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি নলও সারথিপদ গ্রহণ করেছিলেন। তা এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়।

রাজা। আজ্ঞা, হাঁ, তার সন্দেহ কি?

অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈন্যে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের অনুগ্রহে।

রাজা। (সহাস্য-বদনে) দেবি, তুমি কি ভেবেছ, যে ও নরাধম-দামাদের একবারে পরিত্যাগ করে গেল? বিরাল একবার যেখানে দুধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি আর ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হলেই ও যে আবার আসবে, তার সন্দেহ নাই।

তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের কর্ত্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবেন; আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হবেন না।

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর।

রাজা। তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যক কি?

অহ। সে কি, নাথ? এত বড় মেয়ে হলো, আরো কি তাকে আইবড় রাখা যায়? (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। এ কি? আহা! এ বংশীধ্বনি কে কচ্যে?

অহ। (অবলোকন করিয়া) ঐ যে তোমার কৃষ্ণা তার সখীদের সঙ্গে উদ্যানে বিহার কচ্যে।

তপ। আহা, মহারাজ, দেখুন, যেন বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচ্যেন!

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে কোন পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটীকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায়?

রাজা। সে কি, প্রিয়ে?

অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি, কিম্বা অন্য কোন যবনরাজ, জনরবস্বরূপ বায়ুসহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? কেন, তোমার পূর্ব্ব পুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি বিস্মৃত হলে? (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি!

(নেপথ্যে গীত।)

[ধানী মূলতানী—কাওয়ালী।]

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান।
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,
ধৈরয মন না ধরে;
সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে,
লাজ ভয় হলো অবসান।

নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে,
ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,
চিত্ত যে বঞ্চিত তুরিত মিলনে,
না দেখি তাহার সুবিধান ॥

তপ। আ, মরি, মরি! কি সুধাবর্ষণ! মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন্ কখন এইরূপ সুস্বর আকাশমার্গে শুনে থাকি! তাতে করে আমার জ্ঞান ছিল, যে সুরসুন্দরী ভিন্ন এ স্বর অন্যের হয় না।

রাজা। আহা, তাই ত! ভাল মহর্ষি, কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো!

অহ। সে কি, মহারাজ? তুমি কি জান না? কৃষ্ণা যে এই পোনেরতে পা দিয়েছে!

তপ। মহারাজ, এ কলিকালে স্বয়ম্বরের প্রথাটা একবারেই উঠে গেছে; নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোভে কত দিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলে, আমরা যে মনুষ্য, কোনমতেই ত বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বু তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ভগবতি আমরা কি আর এ আপদ হতে কখন অব্যাহতি পাবো?

অহ। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সে কাল আছে? স্বয়ম্বর সমারোহ দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরীকন্যা জন্মে, সে কুলের মান রক্ষা করা ভার।

তপ। তা সত্য বটে। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। মহারাজ,

ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাক্‌বে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাক্‌বেন? অদ্যাবধি চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক পাদ ধর্ম্ম আছে।

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক ত। আহা! অনেক দিন হলো, মেয়েটিকে ভাল করে দেখি নাই।

অহ। এই যে ডেকে আনি।

তপ। মহিষি, আপনার যাবার আবশ্যক কি? আমিই যাচ্যি।

অহ। (উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি? আপনি যাবেন কেন?

রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। ঐ দেখ, কৃষ্ণা আপনিই এই দিকে আস্‌চে।

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সৌভাগ্য! মহিষি, আপনাকেও আমি শত ধন্যবাদ দি, যে আপনি এ দুর্ল্লভ রত্নটিকে লাভ করেছেন! আহা! আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন! আপনারা যে পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্য করেছিলেন, তার সংখ্যা নাই।

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) ভগবতি, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকে। ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিত্র, আর বিদ্যাবুদ্ধি দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বল্‌তে পারিনে।

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ।)

এসো, মা এসো। মা, তুমি কি ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে চিন্‌তে পাচ্যো না?

কৃষ্ণা। ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে প্রথমে চিন্‌তে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ দাসীর দোষ মার্জ্জনা করুন।

তপ। বৎসে, তুমি চিরসুখিনী হও! (রাণীর প্রতি) মহিষি, যখন আমি তীর্থযাত্রায় যাই, তখন আপনার এ কনক-পদ্মটী মুকুল মাত্র ছিল।

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমিও উদ্যানে কি কর্‌ছিলে, মা?

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নূতন তানটি আজ শিখ্‌য়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম। পিতঃ, আপনি অনেক দিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার চলুন! আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত হবেন এখন।

অহ। ওটি কি ফুল, মা?

কৃষ্ণা। মা, এটি গোলাব; আমার ঐ উদ্যান থেকে তোমার জন্যে তুলে এনেছি। (মাতার হস্তে অর্পণ।)

রাজা। পূর্ব্বকালে এ পুষ্প এদেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে আমরা এ মণিটী পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্যে! (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুসুমরত্ন দুষ্ট যবনেরাই এ দেশে আনে! (দূরে দুন্দুভিধ্বনি।)

সকলে। (চকিতে) এ কি?

রাজা। রামপ্রসাদ!

নেপথ্যে। মহারাজ?

(ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। দেখ্‌ত, এ দুন্দুভিধ্বনি হচ্যে কেন?

ভৃত্য যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হলো, দেখ? মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অবহেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন নাকি? (উঠিয়া) আঃ এ ভারতভূমিতে এখন এইরূপ মন্দধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে! আমি শুনেছি যে কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে; তা এদেশেরও কি সেই দশা ঘটলো! হায়! হায়!———

(ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ।)

কি সমাচার?

ভৃত্য। আজ্ঞা, মহারাজ, সকলই মঙ্গল। জয়পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। বটে? আঃ রক্ষা হোক! আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো।——জয়পুরের অধিপতি আমার পরম-আত্মীয়। জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদ্গ্রস্ত হয়ে আমার নিকটে দূত না পাঠিয়ে থাকেন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আমাকে এখন বিদায় দিন। (রাণীর প্রতি) প্রেয়সি, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হলো।

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর, এ অধিনীর এমন কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসসুখ লাভ করে!

রাজা। দেবি, এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা! লোকে যাকে নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখ্লে, সে নরদাস বৈ নয়! অতএব যার এত লোকের সন্তোষণ কত্যে হয়, সে কি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও বিশ্রাম কত্যে পারে?

[ভৃত্যের সহিত প্রস্থান।

অহ। ভগবতি, চলুন, তবে আমরাও যাই। (কৃষ্ণার প্রতি) এসো, মা—আমরা তোমার পুষ্পোদ্যানে একবার বেড়িয়ে আসি গে।

কৃষ্ণা। যাবে, মা? চল না।—দেখ, মা, আজ্ পিতা একবার আমার উদ্যানটী দেখ্‌লেন না?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর—রাজপথ।

(পুরুষবেশে মদনিকার প্রবেশ।)

মদ। (স্বগত) হা! হা! হা! তোমার নাম কি, ভাই? আমার নাম মদনমোহন। হা! হা! হা!—না না;—এমন করে হাস্‌লে হবে না। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে, যা হোক! কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সখী মদনিকা? হা! হা! হা!—দূর হোক!—মনে করি যে হাস্‌বো না; আবার আপনা আপনিই হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্ত্তচূড়ামণি; সে যখন আমাকে চিন্‌তে পারে নাই, তখন আর ভয় কি?—বিলাসবতীর নিতান্ত ইচ্ছা যে এ বিবাহটা কোন মতে না হয়; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চুণকালি পড়ে। দেখা যাক্, কি হয়। আমি ত ভাঙা-মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল করে এক পত্রও লিখেছি। হা! হা! হা! পত্রখানা যে কৌশল করে লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা পাবা

মাত্রেই কৃষ্ণার জন্যে একবারে অস্থির হবে। রুক্মিণীদেবী, শিশুপালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে, যদুপতিকে যেরূপ মিনতি করে পত্র লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ করে লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক্, আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে? ঐ যে ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ দিকে আস্‌চে। আমি ঐ মন্ত্রীকে বিলাসবতীর কথা যে করে বলেছি, বোধ হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। মন্ত্রী মহাশয়, যৌবনাবস্থায় লোকে কি না করে থাকে? তা আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন্, সে কিছু বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়েস। বিশেষতঃ, আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি কাণ্ড না হচ্যে?

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে! কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এত দূর বাধ্য, যে———

ধন। হা! হা! বলেন কি মহাশয়? অলি কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে?

সত্য। মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসবতী বড় সামান্য পুষ্প নয়!

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয়! নৈলে কি আমার মন টলে! (প্রকাশে) আজ্ঞা, আপনাকে এ কথা কে বল্যে? সে একটা সামান্য স্ত্রী, আজ আছে, কাল নাই।

সত্য। মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি ভীমসিংহের

জীবনস্বরূপ। তা তিনি যে এসব কথা শুনলে, এ বিবাহে সম্মত হন, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

ধন। কি সর্ব্বনাশ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত?

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয়; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত করবে? এ বিবাহের কথা প্রচার হলে যে কত লোকে কত কথা কবে, তার কি আর সংখ্যা আছে?

ধন। মহাশয়, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলে কি কেউ তাঁকে অবহেলা করে?

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক নয়। এ যে রাহুগ্রাস! এতে আপনাদিগের নরপতির শ্রীর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা!

ধন। (স্বগত) এ ত বিষম বিভ্রাট! বিভ্রাটই বা কেন? বরঞ্চ আমারই উপকার। মহারাজ যদি এ সারিকাটীকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে আর পায় কে? আমি ত ফাঁদ পেতেই বসে আছি।

সত্য। মহাশয় যে নিরুত্তর হলেন?

ধন। আজ্ঞা—না; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এতদূর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখি, যে তিনি পত্রপাঠমাত্রেই সে দুষ্টা স্ত্রীকে দেশান্তর করেন। তা হলে, বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাকবে না।

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর সুপরামর্শ কি আছে? রাজা জগৎসিংহ যদি এ কর্ম্ম করেন তা হলে ত আর এ বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই।

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তাম্রের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ কে না গ্রহণ করে?

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই। আপনিও বাসায় যেয়ে বিশ্রাম করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) আমাদের মহারাজের সুখ্যাতিটী দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান! ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন্ পন্থাই নাই? কেমন করেই বা থাক্‌বে? এর গতি মহানদের গতির তুল্য। প্রথমতঃ পর্ব্বত-নির্ঝর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি হয়; তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান্ হয়; পরে আর আর স্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। (মদনিকাকে দূরে দর্শন করিয়া) আহাহা! এ সুন্দর বালকটী কে হে? এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্যে।—একে কি আর কোথাও দেখেছি? (প্রকাশে) ওহে ভাই, তুমি একবার এই দিকে এসো ত।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন?

ধন। তোমার নাম কি, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন।

ধন। বাঃ, তোমার বাপ্ মা বুঝি তোমার রূপ দেখিই এ নামটী রেখেছিলেন? তুমি এখানে কি কর, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি।

ধন। হুঁ! মুক্তাফলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থরত্নাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর? কেন? তোমাদের দেশে কি টোল নাই? সে যা হোক, তুমি রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখেছ?

মদ। আজ্ঞা, দেখ্‌বো না কেন? যারা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত দেখ্‌তে বাকি থাকে?

ধন। বাহবা বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি তোমাদের রাজকুমারী দেখ্‌তে কেমন?

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন্।

ধন। অ্যাঁ—কার কাছে নন্?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কিছু কাণে খাট বটে?—বিলাসবতী! বিলাসবতী! শুন্‌তে পেয়েছেন?

ধন। অ্যাঁ—বিলাসবতী কে?

মদ। হা! হা! বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথ্‌থেকে শুন্‌লে? (প্রকাশে) আমি তাকে কেমন করে জান্‌বো?

মদ। আঃ, আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন? আপনি মন্ত্রীবরকে যা যা বল্‌ছিলেন আমি তা সব শুনেছি।

ধন। (স্বগত) এ কথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাশে) হ্যা দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু অন্যের কাছে এ কথার আর প্রসঙ্গ করোনা।

মদ। কেন? তাতে হানি কি?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেটাই খেতে দিচ্যি, এ সব রাজারাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি?

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারি পাগল হে! আমাকে কি কচি ছেলে পেয়েছো, যে মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে?

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলে সন্তুষ্ট হও?

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে ঐ যে অঙ্গুরীটি আছে, ঐ টি আমাকে দেও, তা হলে আমি আর কাকেও কিছু বল্‌বো না।

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বল্‌ছিলে; আবার

তুমিও পাগল হলে নাকি? এ নিয়ে তুমি কি কর্‌বে? এ কি কাকেও দেয়?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই। (গমনোদ্যত।)

ধন। ওহে ভাই, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, রাগ ভরেই চল্যে যে? একটা কথাই শুনে যাও। (স্বগত) এ কথা প্রচার হলে সব বিফল হবে। এখন করি কি? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দি কেমন করে!—কি করা যায়? দিতে হলো!——হায়! হায়! এ অঙ্গুরীটি যে কত যত্নে মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেম,—আর ভাব্‌লেই বা কি হবে?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাঁদচেন না কি? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে? ছি! ছি! আর কি করি? দি! ভাল, এ কর্ম্মটা সফল কত্যে পাল্যে, রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। (প্রকাশে) এই নাও, ভাই। দেখো, ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞা—তবে আমি চল্যেম। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হতভাগা! আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বল্‌তে পারিনে। আর কি হবে, যাই এখন বাসায় যাই॥

[প্রস্থান্।

মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) হা! হা! ধনদাসের দুঃখ দেখ্‌লে কেবল হাসি পায়। হা! হা! বেটা যেমনি ধূর্ত্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে!—এখনই হয়েছে কি? একে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে, তা নৈলে আমার নামই নয়। তা এখন

কেন যাই না! একবার নারীবেশ ধরে রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। ভাল, আমার পরিচয় টা কি দেব? (চিন্তা-করিয়া) হাঁ! তাই ভাল! মরুদেশের রাজা মানসিংহের দূতী। হা! হা! হা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর—রাজ-উদ্যান।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। মহিষি, এ পরম আহ্লাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান্ অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অংশস্বরূপ। তা মহারাজ জগৎসিংহ যে কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র, তার সন্দেহ নাই।

অহ। আজ্ঞা, হাঁ; এ কথা অবশ্যই স্বীকার কত্যে হবে।

তপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস; আর তিনি একজন পরম ধর্ম্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী পুরুষ।

অহ। আপনার আশীর্ব্বাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রলয়-ঝড় কমলিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠে! গুণহীন স্বামীর হাতে পড়্‌লে কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে কতদূর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বল্‌বো? কিন্তু এখন যে তার বিবাহ হবে, ঐ কথা আবার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। (রোদন।)

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না! হতেই ত পারে।

অহ। ভগবতি, আমার এ হৃদয়সরোবরের পদ্মটী কাকে দেবো? কে তুলে লয়ে চলে যাবে? আমি যে সারিকাটীকে এতদিন প্রাণপণে পালন কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো? আমার এ আঁধার ঘরের মণিটী গেলে আমি কেমন করে প্রাণধারণ কর্‌বো? (রোদন।)

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। যেখানে কন্যা, সেখানেই এ যাতনা সহ্য কত্যে হয়। দেখুন, গিরীশমহিষী মেনকা সম্বৎসরের মধ্যে তাঁর উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটী দিন বই দেখতে পান্ না! তা ও চিন্তা বৃথা। চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন।

অহ। যে আজ্ঞা—তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। বল কি, দূতি? তোমার কথা শুন্‌লে, আমার ভয় হয়। তুমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে এলে?

মদ। রাজনন্দিনি, পোষা পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখী সকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল। কিন্তু আপনার চন্দ্রবদন দেখে, আমি সে সব দুঃখ এতক্ষণে ভুল্‌লেম!

কৃষ্ণা। ভাল দূতি, রাজা মানসিংহ, আমার পিতার কাছে দূত না পাঠিয়ে, তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন?

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি বুদ্ধিমতী। আপনি ত বুঝ্‌তেই পারেন। যে যাকে ভাল বাসে, সে কি তার মন না জেনে কোন কর্ম্মে হাত দেয়?

কৃষ্ণা। (সহাস্যবদনে) কেন? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে ভাল বাসেন?

মদ। রাজনন্দিনি, ভাল বাসেন কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যেন? আমাদের মহারাজ রাতদিন কেবল আপনার কথাই ভাব্‌চেন, আপনার নামই কচ্যেন। তাঁর কি আর কোন কর্ম্মে মন আছে?

কৃষ্ণা। কি আশ্চর্য্য! তিনি ত আমাকে কখন দেখেন নাই। তবে যে তিনি আমার উপর এত অনুরক্ত হলেন, এর কারণ? ভাল দূতি, বল দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী?

মদ। রাজনন্দিনি, মহারাজের এখনও বিবাহ হয় নাই। আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তিনি আর কাকেও বিবাহ কর্‌বেন না।

কৃষ্ণা। সত্য না কি?

মদ। রাজনন্দিনি, আমি কি আপনার কাছে আর মিথ্যা কথা বল্‌ছি? মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পর লোকের মুখে আপনার আবার গুণ শুনে তিনি যেন একবারে পাগল হয়ে উঠেছেন।

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজা দেখ্‌তে কেমন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাঁর রূপের কথা এক্ এক্ করে আপনাকে আর কি বল্‌বো? তাঁর সমান রূপবান্ পুরুষ আমার চক্ষে ত কখন দেখি নাই। আহা! রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা যেন একবারে শিহরে উঠলো। আ, মরি মরি! কি বর্ণ; কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। রাজনন্দিনি, আমি সঙ্গে করে মহারাজের একখানা চিত্রপট এনেছি; আপনি যদি দেখ্‌তে চান, ত আমি কোন

সময়ে এনে দেখাব। দেখ্‌লেই আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন, যে তাঁর কেমন রূপ।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা কি সত্য হবে? হতেও পারে। (প্রকাশে) দেখ, দূতি, তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। এখন আমি যাই। আমার সখীরা ঐ সরোবরের কূলে আমার অপেক্ষা কচ্যে।

মদ। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণা। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) দেখো, তুমি ভুল না, দূতি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ যদি এ নারীরত্নটী পান, তা হলে কি আর তার মুখ্ দেখ্‌তে চাইবেন? আহা! এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আবার গুণও তেমনি! যেন সাক্ষাৎ কমলা। আহা! এমন সরলা স্ত্রী কি আর হবে? (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক। এঁর মন্‌টা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল করে লওয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দিকে ফেরে? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দূত যে অতি ত্বরাই এখানে আস্‌বে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আস্‌চেন্। আমি এই গাছটার আড়ালে একটু দাঁড়াই না কেন? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ।)

তপ। মহারাজ, রাজদূতের নাম টা কি বল্‌ছিলেন?

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিটে অতি গুণবান্

আর বহুদর্শী। আর রাজা জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তাঁর সুখ্যাতিও বিস্তর।

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান্ একলিঙ্গের অসীম কৃপা বল্‌তে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রকে জানকী সুন্দরীর পাণিগ্রহণ কত্যে এনে উপস্থিত করে দিলেন। এ হতে আর আনন্দের বিষয় কি আছে, বলুন্?

রাজা। আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটী সুসম্পন্ন হলে আমি আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হবো। তা এতে আর বিলম্ব কি? শুভ কর্ম্ম শীঘ্রই করা উচিত।

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্ম্মে বিলম্বের প্রয়োজন কি? আমার কৃষ্ণা——(রোদন।)

রাজা। (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে, এ শুভ কর্ম্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা উচিত?

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে একজন পরের হাতে সমর্পণ কর্‌বো? (রোদন।)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেবি, বিধাতার বিধি কে খণ্ডন কত্যে পারে? ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা কোথায় ছিলে? বিধাতার সৃষ্টি এইরূপেই চলে আস্‌চে। কত শত কুসুমলতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্যান থেকে এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে; আর তারাও নূতন আশ্রমে ফলফুলে শোভমান হয়।

নেপথ্যে গীত।

[আশাগৌরী—আড়া।]

অসুখী ভ্রমর দলে।
নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে॥

অবসান দিনমান্, শশী প্রকাশিল,
কুমুদী হেরি হাসিলো,
যুবক যুবতী, হরষিত অতি,
বিরহিণী ভাসিছে আঁখি জলে।
চক্রবাক্ চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত,
কপোতী পতি মিলিত,
নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে,
কার মনঃ দহিছে দুখানলে॥

রাজা। আহা!

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটী এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচবো! (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। দেখুন, আপনার দুঃখে মহারাজও অতি বিষণ্ণ হচ্যেন!

(কৃষ্ণার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। এসো, মা, এসো। (শিরশ্চুম্বন।)

কৃষ্ণা। পিতঃ, মা আমার এমন কচ্যেন কেন? তুমি কাঁদ কেন মা?

অহ। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) বাছা, তুমি কি এত-দিনের পর তোমার এ দুঃখিনী মাকে ছেড়ে চল্লে? আমার আর কে আছে, মা, যে আমাকে এমন করে মা বলে ডাক্‌বে? (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি মা? তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা? (রোদন।)

রাজা। ভগবতি, মোহস্বরূপ কুসুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ্ণ!

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এই জন্যেই পূর্ব্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করে্য, বনবাসী হতেন্।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

রাজা। কিঁ সমাচার, রামপ্রসাদ?

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসমীপে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন? (প্রকাশে) আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কত্যে বল্‌গে যা। আমি ত্বরায় যাচ্যি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই। আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হলো।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ দূত আমার জন্যেই এসেছে। এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না।

অহ। চলুন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসুন্।

[সকলের প্রস্থান।

মদ। (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়! তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না কর্‌বে তবে আর কর্‌বে কাকে? এই

যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল করে জান্‌তে পেলেম না। যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে, যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন।—আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন গিয়ে ত আবার পুরুষ বেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ্ ধনদাসের সর্ব্বনাশ কর্‌বো! হা! হা! যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বল্যে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম! যে মহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট কত্তে পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন। হায়! হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি।——এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে আস্‌চেন। হয়েছে আর কি!——মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্যে, মনটা যেন একটু ভিজেচে। তাই যদি না হবে তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখ্‌তে চান কেন? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায়। হা, হা, হা! এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্ত্তি নয়। নাই বা হলো বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হোক না কেন, ইঁদুর ধর্‌তে পাল্যেই হয়।

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। এই যে! দূতি, তুমি আমার তল্লাস কচ্যো না কি? তোমাদের মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন আমি এই শুনে এলেম। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতে ছিলে——

মদ। রাজনন্দিনি, তাও কি কখন হয়। আমাদের মতন লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে?

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, এ বিষয়ে আমি দেখ্‌ছি, একটা না একটা বিষম বিবাদ ঘটে উঠ্‌বে! তুমি কি শোননি যে জয়পুরের রাজাও আমার জন্যে দূত পাঠিয়েছেন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন? আপনি অনুমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এক মুহূর্ত্তে ভস্মরাশি করে ফেল্‌তে পারেন।

কৃষ্ণা। (সহাস্যবদনে) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্ব্বদাই কচ্যো। তা দেখি, কি হয়।

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাঁকে আর কে পায়?

কৃষ্ণা। (হাসিয়া) দেখ, দূতি, পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদুপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো। এখন দেখি, কে জেতেন্! তুমি তবে এখন তোমাদের রাজদূতের সঙ্গে একবার দেখা কর গে।

মদ। যে আজ্ঞা। (কিঞ্চিৎ গিয়া পুনরাগমন পূর্ব্বক) রাজনন্দিনি, আপনাকে যে আমাদের মহারাজের এক খানা চিত্রপট দেখাব, বলেছিলাম, এই দেখুন। (হস্তে প্রদান) এখানি এখন আপনার কাছে থাক্; আমাকে আবার ফিরে দেবেন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাজা মানসিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত চঞ্চল হলো এর কারণ কি? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) অ্যাঁ! এমন রূপ! আহা! কি অধর! কি হাস্য! এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে? আ মরি, মরি!—ও দূতী যা বলেছিল, তা সত্য বটে! হায়! হায়! আমার আদৃষ্টে কি তা হবে?—আমার মনটা যে অতি চঞ্চল

হয়ে উঠ্‌লো।—না——এখানে আর থাকা উচিত নয়; কে আবার এসে দেখ্‌বে।' যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জ্জনে চিত্রপট খানি দেখিগে। আহা! কি চমৎকার——

[চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর—রাজনিকেতন সম্মুখে।

(মরুদেশের দূত এবং [পুরুষবেশে] মদনিকার প্রবেশ।)

দূত। কি আশ্চর্য্য! তবে এ পত্রের কথাটা সত্য?

মদ। আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বৈ কি? রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে আমাকে দেন; তার পর আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই।

দূত। যা হউক, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, তা না হলে তোমাদের সুকুমারী কি তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত হন্? আহা! বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা! কেউ বা মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায়! এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয়! মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বল্‌বো?

মদ। দেখুন দূত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চল্‌বেন। এ পত্রের কথা এখানে প্রকাশ কর্‌বেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজ্জায় একবারে প্রাণত্যাগ কর্‌বেন্।

দূত। হাঁ! সে কি কথা? আমি ত পাগল নই। এ কথাও কি প্রকাশ কত্যে আছে?

মদ। এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, ওকে, বোধ হয়, আপনি ভাল করে চেনেন্ না।

দূত। না, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই।

মদ। মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, তা শুন্‌লে বোধ হয়, আপনি অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠেন্!

দূত। বটে?

মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো। মহাশয় ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন? তা হলে বড় ভাল হয়।

দূত। কেন? ওটা বলে কি?

মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আন্‌তে লজ্জা করে। ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে মহারাজ মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দত্তকপুত্র মাত্র; আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত-অধিকারী নন্।

দূত। অ্যাঁ—কি বল্লে? ওর এত বড় যোগ্যতা! কি বল্, বো? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কত্যেম!

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ চল্‌বে না। যদি বাক্যবাণ দ্বারা ও দুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই; নচেৎ অন্য কোন অত্যাচার করাটা ভাল হয় না।

দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীর কাছে যাই। এর পর যা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শৃগালের মুখে সিংহের নিন্দা! এ কি কখন সহ্য হয়।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) যাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, এও ত বড় আশ্চর্য্য! আমি একজন বেশ্যার সহচরী; বনের পাখীর মতন কেবল স্বেচ্ছার অধীন; কখনই সংসার পিঞ্জরে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু সুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন?——

সত্য বটে!—লজ্জা আর সুশীলতাই স্ত্রীজাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা! এ দুটী পদ্ম এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলাম, তা কেবল এখন্ বুঝ্তে পাচ্যি। এই যে ধনদাস এ দিকে আস্‌চে।

(ধনদাসের প্রবেশ।)

মহাশয়, ভাল আছেন ত?

ধন। আরে মদন যে! তবে ভাল আছ ত? ভাই, তুমি সে অঙ্গুরীটী কোথায় রেখেছো?

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বল্‌তে লজ্জা করে! আর বোধ হয়, আপনি তা শুন্‌লেও রাগ করবেন!

ধন। সে কি? কেন? রাগ কর্‌বো কেন?

মদ। আজ্ঞা, তবে শুনুন্। এই নগরে মদনিকা বলে একটী বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভাল বাসি! সেই আমার কাছ থেকে সে অঙ্গুরীটী কেড়ে নিয়েছে।

ধন। কি সর্ব্বনাশ! তেমন অমূল্য রত্ন কি একটা বেশ্যাকে দিতে হয়? তোমার ত নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে। ছি! ছি! আর তুমি এত অল্প বয়েসে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর?

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বল্‌লেন, রাগ করবো না, তবে আবার রাগ করেন কেন?

ধন। (স্বগত) তাও বটে; আমিই বা রাগ করি কেন? (প্রকাশে) হা! হা! ওহে আমি তামাসা কচ্ছিলেম। যা হউক, তুমি যে, দেখ্‌ছি, একজন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, বল দেখি, ভাই।

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী গড়ের বাইরে।

ধন। (স্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অঙ্গুরীটী না হয় কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি

সহজে না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশে) হাঁ! কোথায় বল্‌লে ভাই?

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে।

ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষটী দেখ্‌তে ভাল ত?

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের দূত মন্ত্রীর সঙ্গে এই দিকে আস্‌চেন্।

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে, ভাই। তোমাকে আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বল্‌তে বলেছিলেম, তা বলেছো ত?

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখন অবহেলা আছে?

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমুখে কত বল্‌বো?—তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে?

মদ। তার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্যেন কেন? একদিন, না হয়, আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে? আমি এখন যাই, আর দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি, এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) অঙ্গুরীটির উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতেই স্থির হচ্যে না। সেটীর মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা সহজে কি ত্যাগ করা যায়। আহা! মহারাজকে যে কত প্রকারে ভুলিয়ে সেটি পেয়েছিলাম, তা মনে পড়্‌লে সক্ষে জল এসে। তা বড় দায়ে না পড়লে আর সে আমার হাত ছাড়া হতে পার্‌তো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ীর সন্ধান টা পেলে একবার বুঝ্‌তে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে?

(সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ।)

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভাতে যাওয়া যাউক।

দূত। মহাশয়, ইনিই রাজা জগৎসিংহের দূত না?

সত্য। আজ্ঞা, হাঁ!

দূত। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটী অমূল্য রত্নের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, কিন্তু তা বল্যে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসদ্ব্যবহার করা উচিত?

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয়?

দূত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি;—বলি, আপনি যে নিরন্তর মরুদেশের রাজ্যেশ্বরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত কর্ম্ম?

ধন। বলেন কি মহাশয়? এ কথা আপনাকে কে বল্‌লে?

দূত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্লব কখনই নড়ে না।

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ কর্‌বার ইচ্ছা বটে?

দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় কি ফল? কিন্তু আপনি যে এ দুষ্কর্ম্মের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই। আপনাদের নরপতি বেশ্যাদাস; নৃত্য, গীত, প্রেমালাপ—এই সকল বিদ্যাতেই পরম নিপুণ; তা তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মানসিংহের সমতুল্য ব্যক্তি? না সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র?

ধন। (সত্যদাসের প্রতি) মহাশয়, শুন্‌লেন ত? (কর্ণে হস্ত দিয়া দূতের প্রতি) ঠাকুর, কি বল্‌বো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হল্যে তোমাকে আমি আজ্ অমনি ছাড়্‌তেম না!

দূত। কেন? তুমি কি কত্তে? ওঃ! বড় স্পর্দ্ধা যে?

সভ্য। মহাশয়রা ক্ষান্ত হউন। আপনাদের এ বৃথা বাগ্‌-দ্বন্দ্বে প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত?

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার এ বিষয়ে অপরাধ কি? উনিই ত বিবাদ কচ্যেন।

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

বলে। এ কি এ, মহাশয়? আপনাদের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত যে? আপনারা কি লক্ষ্যভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ কল্যেন?

দূত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন? তবে কি না, এই জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি দুই একটা হিতোপদেশ দিছ্যিলেম।

বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা, যে উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হা! হা! হা!

ধন। হা! হা! হা! আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

দূত। আজ্ঞা, হাঁ! আমার বিবেচনায় ওঁর তাই করা উচিত হচ্যে! মহাশয়, মান বড় পদার্থ। অতএব যেন যে মান, এর্‌ রক্ষার বিষয়ে অবহেলা করা অতি অকর্ত্তব্য।

বলে। হা! হা! দূত মহাশয়, আপনি যে দেখ্‌ছি, স্বয়ং চাণক্য অবতার! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, যে আপনাদের মরুদেশে ভগবতী পৃথিবী না কি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব ধরেন? তা বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম্ম কিরূপে চলে?

দূত। বীরবর, বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ সংসার করে না?

বলে। হা! হা! বেশ। (ধনদাসের প্রতি) ও গো মহাশয়, আপনাদের অম্বরদেশের বর্ণনটী একবার করুন দেখি শুনি!

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ণন করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অম্বরের সুখসম্পত্তির সুচারুরূপে বর্ণন হয় না।—মহাশয়, আমাদের অম্বর সাক্ষাৎ অম্বরপ্রদেশই বটে। সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুলতুল্য সুন্দর; আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাণ্ডারে তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ ত স্বয়ং শশধর——

দূত। হাঁ, শশধরের ন্যায় কলঙ্কী বটেন!

বলে। হা! হা! কি বল, ধনদাস?

ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বল্‌বো? পেচক সূর্য্যের আলো ত কখনই সহ্য কত্যে পারে না! আর যদিও ক্ষুধার পীড়নে রাত্রিকালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চন্দ্রের প্রতি কখন প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত কর্‌তে পারে না। তেজোময় বস্তুমাত্রই তার চক্ষের বিষ!

বলে। হা! হা! হা! কেমন, দূতবর! এইবার? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ও আবার কি? (নেপথ্যে বাদ্য।)

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আস্‌চেন। চলুন, আমরা এখন যাই।

(রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষ। (যোড়করে) বীরবর, গণেশগঙ্গাধরশাস্ত্রী নামে এক জন দূত মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয়?

বলে। দূত? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে? আচ্ছা, তাঁকে

রাজসভায় যে যাও ; আমি যাচ্চি। চলুন্ তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় যাই।

[সকলের প্রস্থান।

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ।)

মদ। (স্বগত) এখন ত আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে ; আর এ নগরে বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি ? আমার কৌশলক্রমে রাজনন্দিনী রাজা মানসিংহের উপর এমন অনুরাগিণী হয়েছেন, যে তিনি রাজা জগৎ সিংহের নাম শুন্‌লে একবারে যেন জ্বলে উঠেন ; আর আমার পত্র পেয়ে মানসিংহও দূত পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি হবে ?——যাব বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা ! এমন সুশীলা মেয়ে কি আর দুটী আছে ! হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে চল্‌লেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ সুলোচনা কুরঙ্গিণীকে দগ্ধ না করে। প্রভু, তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা করো। যাই, আমাকে আবার ধনদাসের আগে জয়পুরে পহুঁছিতে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর—রাজ-উদ্যান।

তপস্বিনীর প্রবেশ।

তপ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! আমি ত্রিপতিতে ভগবান্ গোবিন্দরাজের মন্দিরে, কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে, যে কুস্বপ্নটা দেখেছিলাম, তা কি যথার্থই হলো ? রাজা মানসিংহ ও রাজা জগৎ-

সিংহ উভয়েই যখন রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ আশায় এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয় কি বিনা যুদ্ধে নিরস্ত হবে? না এদের ভয়ঙ্কর বিগ্রহে বনস্থলীর সামান্য দুর্দ্দশা ঘট্‌বে? হায়, হায়, কি বিধাতার বিড়ম্বনা! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দীনবন্ধো, তুমিই সত্য! কৃষ্ণাও দেখ্‌ছি রাজা মানসিংহের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব কথা রাজমহিষীকে একবার জানান কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। (স্বগত) সে দুতীটি পাখী হয়ে উড়ে গেল না কি? আমি যে তার অন্বেষণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর সংখ্যা নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) কি আশ্চর্য্য! এ যে কি মায়াবলে আমাকে এত উতলা করে গেল, আমি ত তার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। হা রে অবোধ মনঃ! কেন বৃথা এত চঞ্চল হোস্? নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয়? এ দুতীটি কি আমাকে ছলনা করে গেল? তাই বা কেমন করে বলি? ওদের রাজার দূতপর্য্যন্ত এসেচে। (চিন্তা করিয়া) ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে আমার মনের কথাগুলি বলে কি ভাল করেছি? —তা এরূপ রহস্য কি মনে গোপন করে রাখা যায়? যেমন কীট্ ফুলের মুকুল কেটে নির্গত হয়, এও তাই করে। ঐ যে ভগবতী মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে এইদিকে আস্‌চেন্। বুঝি আমার কথাই হচ্যে। ও মা, ছি! ছি! কি লজ্জা! মা শুন্‌লে বল্‌বেন কি? আমি মাকে, এ মুখ আর কেমন করে দেখাবো? বিধাতা যে এ অদৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বলা যায় না! যাই, এখন সঙ্গীতশালায় পালাই।

[প্রস্থান।

(অহল্যাদেবীর সহিত তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ।)

অহ। বলেন কি, ভগবতী? আপনি কি এ কথা কৃষ্ণার মুখে শুনেছেন?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ। সেই আপনিই বলেছে।

অহ। কি আশ্চর্য্য!——

তপ। মহিষি, লজ্জা যুবতীর হৃদয়মন্দিরে দৌবারিক স্বরূপ। তার পরাভব করা কি সহজ কর্ম্ম? আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছি, তা আপনাকে আর কি বল্‌বো?

অহ। আহা! এই জন্যেই বুঝি মেয়েটীকে এত বিরসবদন দেখ্‌তে পাই! ভাল, ভগবতি, কৃষ্ণা যে রাজা মানসিংহের উপর এত অনুরাগিণী হলো, এর কারণ কিছু বুঝ্‌তে পেরেছেন?

তপ। মহিষি, ও সকল দৈবঘটনা! ঐ যে সূর্য্যমুখী ফুলটী দেখ্‌ছেন, ওটী ফুটলেই সূর্য্যদেবের পানে চেয়ে থাকে; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ বল্‌তে পারে না!

অহ। সূর্য্যদেবের উজ্জ্বল কান্তি দেখে সূর্য্যমুখী তাঁর অধীন হয়; আমার কৃষ্ণা ত আর রাজা মানসিংহকে দেখে নাই——

তপ। দেবি, মনচক্ষু দিয়ে লোকে কি না দেখ্‌তে পায়? বিশেষ ভগবান্ কন্দর্পের যে কি লীলাখেলা তা কি আপনি জানেন না? দময়ন্তী সতী কি রাজা নলকে আপন চর্ম্মচক্ষে দেখে, তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন? (সচকিতে) আহা, কি মনোহর সৌরভ! দেবি, দেখুন্ দেখি, এই যে সুগন্ধটী গন্ধবহের সহকারে আকাশে ভাস্‌ছে, এর যে কোন ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখ্‌তে পাচ্যি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্যে, যে সে ফুলটী অতীব সুন্দর। এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের সুচারুতার ব্যাখ্যা কচ্যে।

দেখি, যশঃস্বরূপ সৌরভেরও আন্‌বেন, এই রীতি। মরুদেশের অধিপতি মানসিংহ রায় ত একজন যশোহীন পুরুষ নন্।

অহ। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি।)

তপ। দেখুন মহিষি, রাজনন্দিনীর মনের যা ভাব, তা এখনিই প্রকাশ্ হবে।

নেপথ্যে গীত।

[ভৈরবী—মধ্যমান]

তারে না হেরে আঁখি ঝুরে,
প্রাণ হরে কামশরে জরজরে।
রজনী দিবসে মানসে নাহি সুখ,
মনোদুখ তোমা বিনে, সই, কহিব কাহারে।
মলয় পবন দাহন সদা করে,
কোকিলের কুহুরবে তায় হৃদয় বিদরে॥

তপ। আহা! ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হলে, কোকিলকে কি কেউ নীরব করে রাখ্‌তে পারে? সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারাত্র পঞ্চস্বরে ব্যক্ত করে। যৌবনকাল এলে মানবজাতির হৃদয়ও সেইরূপ চুপ করে থাক্‌তে পারে না।

অহ। সে যা হউক্। ভগবতি, আপনার কথাটা শুনে যে আমার মন কত উতলা হয়ে উঠলো, তা বল্‌তে পারি না। হায়, হায়, আমার মতন হতভাগিনী স্ত্রী কি আর আছে? মেয়েটীর ভাল করে বিবাহ দেবো, এই সাধটী বড় সাধ ছিল, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় দেখ্‌ছি সকলই বিফল হলো। (রোদন)

তপ। কেন, মহিষি? বিফলই হবে কেন?

অহ। ভগবতি, আপনি কি ভেবেছেন, যে মহারাজ মরু-দেশের রাজাকে মেয়ে দেবেন? একে ত রাজা মানসিংহের

সঙ্গে তাঁর বড় সদ্ভাব নাই, তাতে আবার জয়পুরের দূত এখানে আগে এসেছে।

তপ। তা হলই বা! যে ধীবর প্রথমে ডুব দেয়, তাকেই কি সাগর উৎকৃষ্ট মুক্তাফল দিয়ে থাকেন? এ কি কথা, মহিষি? আপনাদের কন্যা, আপনারা যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই দেবেন; এতে আবার অগ্র পশ্চাৎ কি?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আমরা কি স্বেচ্ছাধীন।—আহা! ভগবতি, একবার এদিকে চেয়ে দেখুন। (অগ্রসর হইয়া) এসো, মা, এসো——

(কৃষ্ণার পুনঃপ্রবেশ।)

তোমার আজ এত বিরস বদন দেখ্‌ছি কেন?

কৃষ্ণা। না, মা, বিরসবদন হবো কেন?

অহ। ও কি ও? তুমি কাঁদ্‌চো কেন মা?

কৃষ্ণা। (নিরুত্তরে রাণীর গলা ধরিয়া রোদন)

অহ। ছি মা, ছি! কেন? তোমার কিসের অভাব, যে তুমি এমন দুঃখিত হলে?

তপ। (স্বগত) আহা, এ ব্রতে নূতন ব্রতী কি না! সুতরাং ব্রতের উদ্দেশ্য দেবতাকে না পেলে কি এ আর স্থির হতে পারে।

অহ। ছি! ছি! ও কি, মা?

কৃষ্ণা। মা, আমি অপরাধ করেছি, যে তোমরা আমাকে জলে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছো? (রোদন)

অহ। বালাই! কেন মা? তোমাকে জলে ভাসিয়ে দেবো কেন? মেয়েরা কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে, মা? (রোদন)

তপ। বৎসে, পক্ষীশাবক কি চিরকাল জননীড়ে থেকে কালাতিপাত করে? এই যে তোমার মা, ইনি কেমন করে

পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতির গৃহে বাস কচ্যেন? তুমিও তো তাই কর্‌বে; তাতে আর ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণা। ভগবতি,——(রোদন।)

অহ। স্থির হও, মা স্থির হও। ছি, মা, কেঁদো না। (রোদন।)

কৃষ্ণা। মা, আমাকে, এত দিন প্রতিপালন করে কি অবশেষে বনবাস দেবে? (রোদন।)

তপ। মহিষি, ঐ যে মহারাজ এই দিকে আস্‌চেন! উনি আপনাদের দুজনকে এ দশায় দেখ্‌লে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তা আপনি এক কর্ম্ম করুন, রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু সরে যান্।

অহ। আয়, মা, আমরা এখন যাই।

[অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান।

তপ। (স্বগত) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা——এ সকল সংসারমায়াশৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ? আমি যে সে মুক্তিলাভ করেছি, এমন ত কোনমতেই বোধ হয় না। আহা! এঁদের দুজনের শোক দেখ্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ! এই মানব-হৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয় সকলের বীজ রোপণ করেছ, তাদের নির্ম্মূল করা কি মনুষ্যের সাধ্য? বিলাপধ্বনি শুন্‌লে যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল হয়ে উঠে!

(রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। ভগবতি, মহিষী না এখানে ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ! তিনি এই ছিলেন; বোধ হয়, আবার এখনি এলেন্ বল্যে।

রাজা। তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে।

(পরিক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাক্‌বেন, মরু-দেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন।

ভপ। আজ্ঞা, হাঁ, শুনেছি বটে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপালগুণে ঘটে!

ভপ। আজ্ঞা, সে কি, মহারাজ? এমত ত সর্ব্বত্রেই হচ্যে।

রাজা। ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী, সুতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে?

(অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ।)

প্রেয়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোনমতেই বিশ্বাস হয় না।

অহ। সে কি, নাথ?

রাজা। আর বল্‌বো কি বল? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের অধি-পতি আবার রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে, আমাকে অনুরোধ কচ্যেন্ যে——

ভপ। নরনাথ, তবে রাজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন? তিনিও ত একজন সামান্য রাজা নন্——

অহ। জীবিতেশ্বর, এ দাসীরও এই প্রার্থনা।

রাজা। বল কি, দেবি? রাজা জগৎসিংহ আমার এক জন পরম-আত্মীয়; তাতে আবার তাঁর দূতই আগে এসেছে; এখন্ আমি কি বলে তাঁকে এ বিষয়ে নিরাশ করি? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির সূত্র কল্যে, এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতে নির্ব্বাণ হবে।

অহ। প্রাণেশ্বর, মহারাষ্ট্রপতি যে এতে হাত দেন, এর কারণ কি? তিনি না স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্যত ছিলেন?

রাজা। দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জান না। সে ত এই চায়। একটা ছল ছুতা পেলে হয়।

তপ। ভাল, মহারাজ, তুমি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হও, তা হলে মহারাষ্ট্রপতি কি কর্‌বেন?

রাজা। তা হলে তার দস্যুদল আবার দেশ লুট কত্যে আরম্ভ কর্‌বে! হায়! হায়! তাতে কি আর দেশে কিছু থাক্‌বে? ভগবতি, আমার কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শত্রুকে নিরস্ত করি?

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব?

অহ। (রাজার হস্তধারণ করিয়া) নাথ, এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচ্যে, ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায়ই শান্ত হবে।

রাজা। মহিষি, তুমিত রাজপুত্রী। তুমি কি জান না, যে এ বিবাহে আমি যাকে নিরাশ কর্‌বো, সেই তৎক্ষণাৎ অসি-কোষ দূরে নিক্ষেপ কর্‌বে? প্রিয়ে, তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্ব্বনাশ কত্যে এসেছে? হায়, আমি বিধাতার নিকট এমন কি পাপ করেছি, যে তিনি আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন্! আমার এমন অমূল্য রত্নটীও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ কত্যে লাগ্‌লো! আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার সর্ব্বনাশের সূচনা হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। ও কি? মহিষি, আপনি কি করেন?

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? (রোদন।)

তপ। বালাই! তিনি আপনার শত্রুকে স্মরণ করুন। মহারাজ, আজ্ঞা হয় ত, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই।

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি? বাছা ত আমার ভাল মন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যে কি মায়ের প্রাণে সয়?——বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল!——(রোদন।)

রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা কর। হায়! হায়! আমি কি নরাধম! আমার মতন ভাগ্যহীন পুরুষ, বোধ করি, আর নাই। এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হলো! তা চল, প্রিয়ে, এখন অন্তঃপুরে যাই। সূর্য্যদেবও অস্তাচলে চল্‌লেন। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে দিননাথ, তোমাকে যে লোকে এই রাত্রকুলের নিদান বলে; তা তুমিও কি এর দুঃখে মলিন হলে!

[সকলের প্রস্থান।

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা! সে এক সময় আর এ এক সময়! আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার আর ভাল লাগে! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! আমি এই মল্লিকা ফুলটীকে আদর করে বন-বিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমীবৃক্ষটীকে সখী-বলে বরণ করেছিলাম। (সচকিতে) ও কি? আহা! সখি, তুমি কি এ হতভাগিনীর দুঃখ দেখে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়্‌চো! কেন? তুমি ত চিরসুখিনী; তোমার খেদের বিষয় কি? মলয়সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালাপ কচ্যে, তা তুমি কি পরের দুঃখ বুঝ্‌তে পার? কি আশ্চর্য্য! (চিন্তা করিয়া) হায়, হায়! এ মায়াবিনী

যে, কি কুলগ্নে এদেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্য্য! আমি যাঁকে কখন দেখি নাই; যাঁর নাম কখন শুনি নাই; যাঁর সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই; তাঁর জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন? কেবল সেই দূতীর কুহকেই আমার মন এত চঞ্চল হলো? আহা! আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলাম? কেনই বা সে মনোহর মূর্ত্তি আমার হৃদ্‌পদ্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম? লোকে বলে, যে সে মরুদেশ অতি রম্য স্থল; সেখানে বসুমতী না কি সর্ব্বদা বিধবাবেশ ধরে থাকেন; কুসুমাদিরূপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সে দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচ্যে! আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, তা আমার মনই জানে। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একবার যাই, দেখিগে, সে দূতীর কোন অন্বেষণ পাওয়া গেল কি না! (পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্যান হঠাৎ এমন পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হলো কেন? (সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! আমি যে গতিহীন হলেম! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা সিহরে উঠলো। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কি? ও! ও! ও! মূর্চ্ছা-প্রাপ্তি; আকাশে কোমলবাদ্য।)

(বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি এ? সর্ব্বনাশ! ভাগ্যে আমি এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম! উঠ, মা, উঠ! এমন কেন হলো?

কৃষ্ণা। (সুপ্তভাবে) দেবি, আপনি ঐ মিষ্ট কথা গুলিন আবার বলুন। আমি ভাল করে শুনি। কি বল্‌লেন? আহা!

"যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না।" আহা! এ অভাগিনীর কপালে কি এমন সুখ আছে?

ভপ। সে কি মা? ও কি বল্‌চো? (স্বগত) হায় হায়, দেখ দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা! একে ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নবযৌবন; কে জানে কার দৃষ্টি———

কৃষ্ণা। (উঠিয়া সসম্ভ্রমে) ভগবতি, আপনি আবার এখানে কোথ্ থেকে এলেন্?

ভপ। কেন, মা, সে কি?

কৃষ্ণা। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, তা শুন্‌লে আপনি একবারে অবাক্ হবেন?

ভপ। কি স্বপ্ন, মা?

কৃষ্ণা। বোধ হলো, যেন আমি কোন সুবর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটী পরম সুন্দরী স্ত্রী একটী পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বল্‌লেন,—বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।

ভপ। তার পর?

কৃষ্ণা। আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি বল্‌লেন,—দেখ, বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই! আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম্ম কর, তা হলে আমারই মতন যশস্বিনী হবে!

ভপ। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণা। উঃ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন্। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌চে।

তপ। কি সর্ব্বনাশ! চল, মা, তুমি অন্তঃপুরে চল। এখানে আর কাজ নাই। দেখ, মা, আমাকে যা বল্‌লে, এ কথা তুমি আর কাকেও বলো না। (আকাশে কোমল বাদ্য।)

কৃষ্ণা। আহা হা! ভগবতি, ঐ শুনুন্!

তপ। কি সর্ব্বনাশ! বৎসে, আমি কি শুনবো?

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি? শুন্‌লেন না, কেমন সুমধুর ধ্বনি! আহা, হা!

তপ্ত। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীঘ্র করে এখান্ থেকে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর—নগরতোরণ।

(বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ।)

বলে। রঘুবরসিংহ।——

প্রথ। (যোড়করে) কি আজ্ঞা, বীরবর?

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকো। আজ্ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যে দিও না।

প্রথ। যে আজ্ঞা! আপনার বিনা অনুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে।

বলে। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোল-যোগ শুন্‌তে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।

প্রথ। যে আজ্ঞা!

বলে। অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত্ত! এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধম দস্যু কি আর দুটী আছে? কিন্তু মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ্দ হলো, এর কারণ আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নৈলে ও এমন পাত্র নয়, যে বৃথা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃষ্ণাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি?

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে) রণবাদ্য।—

দ্বিতী। ভাল, রঘুবরসিংহ——

প্রথ। কি হে?

দ্বিতী। তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো; তুমি নাকি সর্ব্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের নিকট থাকো; রাজসংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে না।

প্রথ। হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে, বলই না শুনি।

দ্বিতী। দেখ, ভাই, আমি শুনেছিলাম, যে এই মহারাষ্ট্র-পতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল; তা উনি যে আবার এসে থানা দিয়ে বস্‌লেন, এর কারণ?

প্রথ। সে কি? তুমি কি এর কিছুই শোন নাই?

দ্বিতী। না, ভাই!

তৃতী। কৈ? আমরা ত এর কিছুই জানি না।

প্রথ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ, আর জয়পুরের অধি-পতি জগৎসিংহ, উভয়েই আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ কর্‌বার আশায় দূত পাঠিয়েছেন।

তৃতী। হাঁ! তা ত জানি। বলি, এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন?

প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে মেয়েটী জগৎ সিংহকে দেন; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জগৎসিংহের চিরকাল বিবাদ; এঁর ইচ্ছা, যে মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন।

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কত্যেই এসেচেন্, তবে আবার সঙ্গে এত সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন কি?

প্রথ। হা! হা! এও বুঝ্তে পাল্যে না, ভাই? এর মত ভিখারী ত আর দুটী নাই। এ ত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই, ছলে হোক, বলে হোক, এর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়।

দ্বিতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির করেছেন, জান?

প্রথ। আর কি স্থির কর্বেন? জয়পুরের রাজদূতকে বিদায় কর্বার অনুমতি দিয়েছেন। আর অল্পদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ কর্বেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা যায় না।

তৃতী। ভাল, তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চুপ্ করে থাক্বেন?

প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কি বড় রণপ্রিয় নন্। তবু যা হউক, রাজপুত্র কি না? এত অপমান কি সহ্য কত্যে পার্বেন?

তৃতী। ওহে, এ দিকে দুজন কে আস্ছে, দেখ দেখি।

প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হচ্যে।

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ।)

সত্য। রঘুবর সিংহ———

প্রথ। (যোড়করে) আজ্ঞা।

সত্য। সব মঙ্গল ত ?

প্রথ। আজ্ঞা, হাঁ !

সত্য। আচ্ছা। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, একটু এই দিকে আসুন্।

ধন। মন্ত্রীমহাশয়, এ কর্ম্মটা কি ভাল হলো ?

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বল্‌বেন না। মহারাজ যে এতে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আপনিই কেন বুঝে দেখুন না ! কিন্তু কি করেন ? এতে ত আর কোন উপায় নাই।

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, এ কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার, দেখ্‌ছি, সর্ব্বনাশ হলো ! আমি যে কি কুলগ্নে আপনাদের দেশে এসেছিলাম তা বল্‌তে পারিনে।

সত্য। কেন, মহাশয় ?

ধন। আর কেন মহাশয় ? প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব ঐ দস্যুদল লুটে নিলে। তার পর রাজা মানসিংহের দূতের হাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত অপমান সহ্য করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার—

সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে ; হয়েছে। ও সব কথা আর মনে কর্‌বেন না। এখন অনুগ্রহ করে এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন্। মহারাজ এটি আপনাকে দিতে দিয়েছেন।

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য্য। (অঙ্গুরীয় গ্রহণ।)

সত্য। মহাশয়, আপনি একজন সুচতুর মনুষ্য। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হতে পরামর্শ দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের

সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, আপনি যদি এ কর্ম্ম কত্তে পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট পরিতুষ্ট কর্‌বেন।

ধন। যে আজ্ঞা! আমি চেষ্টার ত্রুটি কর্‌বো না। তার পর জগদীশ্বরের হাত।

সত্য। আমি কর্ম্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি। আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না।

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই।

সত্য। যে আজ্ঞা, আসুন তবে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) দেখি দেকি, অঙ্গুরীটি কেমন? (অবলোকন করিয়া) বাঃ, এটি যে মহারত্ন! এর মূল্য প্রায় লক্ষটাকা হবে! হা! হা! ধনদাসের ভাগ্য! মাটী ছুঁলে সোণা হয়। হা হা হা! যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, তাকে সকলই দেন। (চিন্তা করিয়া) এ বিবাহে কৃতকার্য্য হলেম না বলে যদি মহারাজ বিরক্ত হন্, হলেনই বা; না হয়, ওঁর রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্রে গিয়ে বাস কর্‌বো। আর কি! আমার ত এখন আর ধনের অভাব নাই। হা! হা! বুদ্ধি বলেই ধনদাস ধনপতি! তবে কি না, এই একটা বাধা দেখ্‌ছি; বিলাসবতীর আশাটা তা হলে একবারে ছাড়্‌তে হয়। যে মৃগ লক্ষ্য করে এত দিন বনে বনে পর্য্যটন কল্যেম; তাকে এখন্ এক প্রকার আয়ত্ত করে কেমন করে ফেলে যাই। (চিন্তা করিয়া) কেন? ফেলেই বা যাব কেন, আমি কি আর একটা বেশ্যাকে ভুলাতে পারবো না! কত কত লোক স্বর্গকন্যাকে বশ্ করেছে, আর আমি কি একটা সামান্য বারাঙ্গনার মনঃ চুরি কত্তে পার্‌বো না! হা! হা! তা দেখি কি হয়।

[প্রস্থান।

প্রথ। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তোমরা কেউ এ লোকটাকে চেন?

দ্বিতী। চিন্‌বো না কেন? ও যে জয়পুরের দূত। আঃ, এক দিন রাত্রে, ভাই, ও যে আমাকে কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বল্‌বো?

তৃতী। কেন? কেন?

দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা মেয়েমানুষের তত্ত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সমস্ত রাত্‌টা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলো না। শেষ প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা আমাকে কেবল চার্‌টি গণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে বল্যে কি, যে তুমি মিটাই কিনে খেও। হা! হা! হা!

প্রথ। হা! হা! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ, রাত্রি যে প্রভাত হলো।

(নেপথ্যে গীত।)

ভৈরব—কাওয়ালী।

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী।
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে
প্রমোদিনী ভানুভামিনী;
শশী চলিল তাই হেরে
বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী
অতি দুখিনী।
মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে
বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে
প্রমোদ ভরে বিপিনচরে,
নব তৃণাসনে হরষিত মনোহরিণী॥

তৃতী। ঐ শুন্‌লে ত? চল, আমরা এখন যাই (নেপথ্যে রণবাদ্য।)

প্রথ। হাঁ———চল——। ঐ যে আর এক দল আস্‌চে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জয়পুর—রাজগৃহ।

(রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী।)

রাজা। বল কি, মন্ত্রি? এ সংবাদ তোমাকে কে দিলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ধনদাস হয় অদ্য বৈকালে কি কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে এ সকল কথা শুন্‌লেই ত আপনি বিশ্বাস কর্‌বেন?

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! আমি কি আর তোমার কথায় অবিশ্বাস কচ্যি যে আমি জিজ্ঞাসা কচ্যি কি, বলি এ কথা তুমি কার্‌ কাছে শুন্‌লে?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র।

রাজা। বটে? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা করে মানসিংহকেই কন্যাপ্রদান কর্‌বেন, মানস করেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমসিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ; তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পূর্ব্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসের পরামর্শই শুন্‌লেন্‌।

রাজা। আঃ, সে গত বিষয়ের অনুশোচনে ফল কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? তবে কি না, বিবেচনা করুন্‌, ধনদাসই এই অনর্থের মূল! সেই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্যে এ রাজ্যের সর্ব্বনাশটা কল্যে!

রাজা। কেন? কেন? তার অপরাধ কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমি আর কি বল্‌বো? ধনদাসের চরিত্র ত আপনি বিশেষরূপে জানেন্ না।

রাজা। কেন? কি হয়েছে, বল না।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই উচিত হয় না। কিন্তু———

রাজা। কেন? ধনদাসের এতে অপরাধটা কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতিমূর্ত্তি যে ও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি আপনি এখনও বুঝ্‌তে পাচ্যেন না?

রাজা। কৈ, না! কি কারণ, বল দেখি শুনি।

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদরপূর্ণ কর্‌বে, এই কারণ, আর কারণ কি? মহারাজ, ওর মত স্বার্থপর মানুষ কি আর দুটী আছে?

রাজা। বটে? তাই ও এ বিষয়ে এত উদ্যোগী হয়েছিল? আমি তখন বুঝ্‌তে পারি নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আসুক। তা এখন এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, বল দেখি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

রাজা। (সরোষে) বল কি, মন্ত্রি? তুমি উন্মাদ হলে না কি? এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহ্য কত্যে পারে?—কেন, আমার কি অর্থ নাই?—সৈন্য নাই? না কি বল নাই?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে মহারাজের অভাব কিসের?

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হতে বল্‌চো কেন? মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন প্রিয়তর? ছি! তুমি এমন কথা মুখেও আন! দেখ, প্রতিদুর্গ পতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও,

যে তারা পত্রপাঠমাত্র সসৈন্যে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ—

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন্—

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথা বল্‌ছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল করে বল দেখি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায়, কোন কোন লোকে বলে যে তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন্।

রাজা। বটে? মরুদেশের বর্ত্তমান রাজা মানসিংহ ত, গোমানসিংহের পুত্র। গোমানসিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ, বীরসিংহের কনিষ্ঠ ছিলেন; তা ধনকুলসিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে? যার শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন।

রাজা। অবশ্য পাবেন! আমি তাঁকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাবো! দেখ, মন্ত্রি, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা, যে সে আমার বিপক্ষতা করে! এখন্ দেখি, আপন রাজ্য কি করে রাখে।

মন্ত্রী। মহারাজ,———

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? যাও———

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই মহৎকুলের প্রসাদে মনুষ্যত্ব লাভ করেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা———

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না; মন্ত্রি, তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

রাজা। মন্ত্রি, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়; কিন্তু অপযশঃ চিরস্থায়ী। আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল কর্‌বে। বরঞ্চ ধনে প্রাণে মর্‌বো, সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটী যেন কেউ না বলে, যে অম্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছি! আমার সে অপযশঃ হতে সহস্রগুণে মরণ ভাল। তা তুমি যাও।

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ! (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়! হায়! দুষ্ট ধনদাসটাই এই অনর্থ ঘটালে!

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো! এতদিন রাজভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি। তরবার চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাক্‌লে মলিন ও কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, ধনদাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুকর্ম্ম করেছি, সকলেতেই ঐ দুষ্ট আমার গুরু। ওঃ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি। তা দেখি, এবারও কি হয়?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ।

(বিলাসবতী এবং মদনিকা।)

বিলা। বাঃ, তোর, ভাই, কি বুদ্ধি? ধন্য যা হউক।

মদ। (সহাস্য বদনে) সে বড় মিছা কথা নয়? আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা-আপনি হেসে মত্যে হয়। হা! হা! হা!

বিলা। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থই চিন্‌তে পারে নাই?

মদ। তা পার্‌লে কি ও আমাকে আর এ অঙ্গুরীটী দিত?

বিলা। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয় টা দিতিস্?

মদ। কেন? উদয়পুরের লোককে বল্‌তেম, আমার জয়পুরে বাড়ী। আর জয়পুরের লোককে বল্‌তেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী। আর যেখানে দেখ্‌তেম, দুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আদতে যেতেম না।

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি ভাই।

মদ। হা! হা! রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দূত, রাজ-কুমারী, আমি কার্ সঙ্গে না দেখা করেছি? আর কত বেশ যে ধর্‌তেম, তার আর কি বল্‌বো?

বিলা। তাই ত? ভাল, মদনিকে, রাজকুমারী কৃষ্ণা কি বড় সুন্দরী?

মদ। আহা! সুন্দরী বল্যে সুন্দরী? ও কথা, ভাই, আর

জিজ্ঞাসা করো না? আমি বলি, এমন রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বিলা। ও কি লো? তুই যে একবারে বিরসবদন হলি? কেন? তিনি কি এতই তোর মনঃ ভুলিয়েছেন? ই! ই! অবাক্ কল্যে মা!

মদ। ভাই, বল্‌বো কি! রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কথা মনে হলে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। আহা! সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুল্‌তে পারে।

বিলা। বলিস্ কি লো? তিনি কি এমন সুন্দরী? কি আশ্চর্য্য! আয়, ভাই, আমরা এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাল করে বল দেখি, শুনি।

মদ। কেন? তাঁর কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে, বল?

বিলা। কে জানে, ভাই? তোর মুখে তাঁর কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছা হচ্যে, যে উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আসি।

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষুঃ দিয়েছেন!—সে যাক্ মেনে, এখন্ মহারাজ কদিন এখানে আসেন নাই, বল দেখি।

বিলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? আজ তিন্ দিন।

মদ। বটে? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসবার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। বোধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন! তা হবেনই ত। তাঁর দূতকে আমি যে জুত খাইয়ে এসেছি,—হা! হা! ধনদাস, ভাই, আর এ জন্মেও কারো ঘটকালি কর্‌বে না। হা! হা! হা!

বিলা। হা! হা! হা! বোধ হয় না।

মদ। দেখ, সখি, মহারাজ, বোধ করি, আজ্ এখানে আস্‌বেন এখন। তা তুমি, ভাই, যদি তাঁকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইবো না।

বিলা। ও মা, সে কি লো? ছি! ছি! তাও কি কখন হয়?

মদ। হবে না কেন? বুদ্ধি থাক্‌লেই সব হয়? এই যে এসো না, তোমাকে, না হয়, মানভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি। (উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধ। (বদনাবৃত করণ।)

বিলা। হা! হা! হা! বেশ লো বেশ! তুই; ভাই, কত রঙ্গই জানিস্? তা আমি এখন কি কর্‌বো, বল?

মদ। (গাত্রোত্থান করিয়া) কি আপদ! তুমিই না হয়, মান করে বসো। আমি নায়ক হয়ে সাধি!

বিলা। (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা—এই আমি বস্‌লেম্।

মদ। এখন মান কর।

বিলা। এই কল্যেম। (বদনাবৃত করণ।)

মদ। হে সুন্দরি, তোমার বদনশশীকে অভিমানরূপ রাহু-গ্রাসে দেখ আজ্ আমার চিত্তচকোর———

বিলা। হা! হা! হা!

মদ। ছি! ছি! ও কি? ঐ ত সব নষ্ট কল্যে।—এমন সময়ে কি হাস্‌তে হয়?

বিলা। ঐ না, মহারাজ এই দিকে আস্‌চেন?

মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে যেন এমন করে হেসে উঠ না। আমি এখন যাই। এত দিনের পর আজ্ ধনদাসের মাথা খাবার যোগাড় হয়েছে।

[প্রস্থান।

(রাজা জগৎসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আজ্ তিন দিন এখানে আসি নাই। আর কেমন করেই বা আস্‌বো ? আমার কি আর নিশ্বাসত্যাগ কর্‌বার সাবকাশ ছিল।—এ তিন দিনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য এসে এ নগরে একত্র হয়েছে। আর ধনকুলসিংহও প্রায় আট, দশ হাজার লোক সঙ্গে করে আস্‌চেন। শত সহস্র বীর। দেখি, এখন মানসিংহ আপন রাজ্য কেমন করে রক্ষা করে ? সে যাক্। এ গৃহে ত পুষ্প-ধনুঃ আর পঞ্চশর ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ ভগবান্ কন্দর্পেরভূমি! তা কৈ, বিলাসবতী কোথায়! (প্রকাশে) ওহে, বসন্ত এলে কি কোকিল নীরবে থাকে ? (অবলোকন করিয়া) এই যে—কেন প্রিয়ে, তুমি এত বিরসবদন হয়ে বসে রয়েছো কেন ? এ কি——এ কএক দিন না আসাতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ ? (নিকটে উপবেশন।) দেখ, ভাই, তুমি কখন এমন ভেবো না, যে আমি সাধ করে তোমার কাছে আসি নাই।—কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে কথা কইলে কি, ভাই, তোমার জাত যাবে ? একটা কথাই কও। এ কি ? একবারে নিস্তব্ধ!—তা তুমি যদি ভাই, আমার সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহস্র কর্ম্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে।

বিলা। যাওনা কেন ; আমি কি তোমাকে বারণ কচ্যি ?

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি আমার উপর আজ্ এত দয়াহীন হলে ?

বিলা। সে কি, মহারাজ ? আপনি হচ্যেন রাজকুল-চূড়ামণি ; তাতে আবার রাজা ভীমসিংহের জামাই হবেন ;—আমি একজন——

রাজা। তুমি, দেখ্‌ছি, ভাই, আমার উপর যথার্থই রগেছো। —ছি! ও কি? তুমি যে আবার নীরব হলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অনুগত, তার উপর কি এত রাগ করা উচিত? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) আহা! এমন সুমধুর ধ্বনি শুন্‌লেও কি তোমার আর রাগ যায় না?

(নেপথ্যে গীত।)

[কাফীজংলা—যৎ।]

মনে বুঝে দেখ না,
এ মান সহজে যাবে না,
ভাকি জান না?
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরী তাহার প্রতি;
তার প্রতীকার, না হলে আর
কোন কথা কবে না!
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী
হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধরে সাধনা!

রাজা। হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, ভাই, তোমার সখীরা আমাকে বড় সৎপরামর্শ দিচ্যে। তা এসো, তোমার পায়েই ধরি! এখন তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা কর। (পদ-ধারণ।)

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি, মহারাজ? ছি! ছি! আমি কেবল আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়; বলি দেখি, মহারাজ নারীর মান রাখেন কি না।

রাজা। আর, ভাই, পরিহাস! ভাগ্যে তোমার রোগের

ঔষধ পেলেম, তাই রক্ষা।———যা হউক্, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো?

বিলা। কেন, সখে, আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না!

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। আরে এসো! দেখ, সখি, তোমাকে দেখ্‌লে আমার ভয় হয়।

মদ। ওমা!—সে কি, মহারাজ? আপনি কি কথা আজ্ঞা করেন?

রাজা। তুমি, সখি, মদন-কেতু। তুমি যে স্থানে বায়ু-চালনা কত্যে থাক, সেখানে কি আর রক্ষা থাকে। অনবরত কাম-দেবের রণভেরি বাজ্‌তে থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হয়ে উঠে।

মদ। আপনার তার নিমিত্তে চিন্তা কি, মহারাজ? আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন্, তার উচিত ঔষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে। এমন বিশল্যকরণী থাক্‌তে আপনার ভয় কি?

রাজা। হা! হা! সাবাশ্, সখি, ভাল কথা বলেছো। তুমি, ভাই, সরস্বতীর পিতামহী!——যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (স্বর্ণহার প্রদান।)

মদ। (প্রণাম করিয়া) আমি মহারাজের একজন ক্ষুদ্র দাসী মাত্র!

রাজা। বসো। (মদনিকার উপবেশন।) দেখ, সখি, তুমি ধনদাসের বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বল্‌ছিলে, সে কি সত্য?

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সখীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন্।

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত্ত আর স্বার্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি; কিন্তু ওর যে এত দূর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না!

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখ্‌লে, স্বকর্ণে শুন্‌লে ত আপনার বিশ্বাস হবে?

রাজা। হাঁ! তা হবে না কেন? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে।

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম্ বলে।

[প্রস্থান।

বিলা। নরনাথ, দুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল।

রাজা। তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ, (হস্ত ধরিয়া) বিশেষতঃ, তুমি থাক্‌তে, ভাই, আমি কি আর কাকেও ভাল বাস্‌তে পারি!

বিলা। ঐ তো, মহারাজ, এই সকল মধু মাখা কথা কয়েই আপনারা কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) যথার্থ বলুন্ দেখি, মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না?

রাজা। রাম বল! এ বিবাহে আমার কি আবশ্যক? তবে কি না, ধনদাসের মন্ত্রণা শুনে আমার, ভাই, অহি মূষিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্যেই এ সব উদ্যোগ——

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ।)

মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল হয়। ধনদাস আস্‌চে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই, এখন মহারাজকে একবার প্রমাণটা দেখিয়ে দাও (রাজার প্রতি) আসুন তবে, মহারাজ!

রাজা। (উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই যাব। এমন মাজীর হাতে নৌকা দেব তার ভয় কি? (উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি।)

বিলা। (স্বগত) ধনদাস ধূর্ত্তরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ্ যে ফাঁদ পেতেছে, তা থেকে এ শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

(ধনদাসের প্রবেশ।)

এসো, এসো, ধনদাস, বসো। তবে, ভাই, ভাল আছ ত?

ধন। (বসিয়া) আর, ভাই, ভাল? কেমন করে ভাল থাক্‌বো, বল? উদয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রাজসম্মুখে ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে যে কত কথা শুনি, তার আর কি বল্‌বো? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছো, এই ভাল।

বিলা। গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে?

ধন। না, তা ত থাকে না। তবে কি না তুমি যদি, ভাই, আমার এ মেঘাবৃত গগনের পূর্ণশশী হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে?

মদ। (জনান্তিকে) মহারাজ, শুন্‌ছেন।

রাজা। (জনান্তিকে) চুপ্———

ধন। (স্বগত) মদনিকা না হবে ত সহস্রবার আমাকে বল্লেচে, যে বিলাসবতী মনে মনে আমাকেই ভাল বাসে। আর এর ভাব ভঙ্গি দেখ্‌লে সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে? আমি যে তোমাকে কত ভাল বাসি, তা কি তুমি জান না?

বিলা। (ব্রীড়া-সহকারে) তা ভাই, আমি কেমন করে জান্‌বো?

ধন। সে কি, ভাই? তুমি কি এও জান না, যে ভেক সর্ব্বদা কমলিনীর সহিত সহবাস করে বটে, কিন্তু সে ফুল যে কি সুধা-রসের আকর, তা কেবল মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজা গুলার কর্ম্ম বোঝা? হা! হা! হা! হা!

রাজা। (জনান্তিকে) শুন্‌লে? শুন্‌লে বেটার স্পর্দ্ধার কথা? ইচ্ছা হয় যে এ নরাধমের মাথাটা এই মুহূর্ত্তেই কেটে ফেলি (অসি নিষ্কোষ করণে উদ্যত।)

মদ। (জনান্তিকে) ও কি মহারাজ? আপনি করেন কি? (হস্ত ধারণ।)

ধন। দেখ, বিলাসবতি,——

বিলা। কি বল, ভাই?

ধন। আমি ভাই, তোমার নিতান্ত চিহ্নিত দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কর্ম্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার। (স্বগত) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহুমূল্য রত্ন আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে? তা একে একবার হাত কর্‌বার কি? এ দেশ থেকে একে একবার নে যেতে পাল্যে হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ্ করে রইলে?

বিলা। আমি আর কি বল্‌বো?

ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈন্য লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কত্যে যাত্রা কর্‌বে। তা সে শস্ত্রবিদ্যায় যত নিপুণ, তা কারই অগোচর নাই! রণভূমি দেখে মূর্চ্ছা না গেলে বাঁচি। হা! হা! হা! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত মানুষ ত আর দুটী নাই।

রাজা। (জনান্তিকে) কি! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে? (মারিতে উদ্যত।)

মদ। (ধরিয়া জনান্তিকে) করেন কি, মহারাজ? একটু শান্ত হউন, আরো কি বলে, শুনুন না।

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্চে, যে হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে নয় মুখে চুণকালি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে!—

রাজা। (জনান্তিকে) ভাল, দেখি, কার মুখে চুণকালি পড়ে। কৃতঘ্ন! পামর!

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তুত করি। চল আমরা কাল দুজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাক্‌লে তোমার আর কি উপকার হবে? বালির বাঁধের ভরসা কি বল?

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়া) রে দুরাচার নরাধম দাসীপুত্র! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা! তুই যে দেখ্‌চি, চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্।

ধন। (সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! ইনি যে এখানে ছিলেন তা ত আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। কি হবে? কোথায় যাব? এই বারে গেলেম, আর কি? এই দুশ্চারিণী মাগীই আমাকে মজালে।

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই? তুই যে কেমন লোক তা আমি এত দিনের পর টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা বসুমতী এমন দুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহ্য কর্‌বেন না! (অসি নিষ্কোষ।)

বিলা। (সম্ভ্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র। সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ আমাকে এর প্রাণটী ভিক্ষা দেন।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথার অন্যথা কত্যে পারি না। আচ্ছা, প্রাণ দণ্ড কর্‌বো না। (অসি কোষস্থ করিয়া) কিন্তু

যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন কত্তে না হয়, এমন দণ্ড বিধান করা আবশ্যক।——রক্ষক?——

নেপথ্যে। মহারাজ?

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রাজা। দেখ্, এ দুরাচারকে নগরপালের নিকট এই মুহূর্ত্তে লয়ে যা। আর তাকে বল্‌গে, যে এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চূণ কালি দিয়ে, একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে, সব দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করে।

রক্ষ। যে আজ্ঞা, ধর্ম্মাবতার! (ধনদাসের প্রতি) চল,—

ধন। (করযোড়ে সজল নয়নে) মহারাজ——

রাজা। চুপ্, বেহায়া। আর আমি তোর কোন কথা শুন্‌তে চাইনে। নে যা একে! ওর মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়।

রক্ষ। চল।

[ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আহা! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা! এখ্‌নই ভায়ার লীলা সম্বরণ হয়েছিল আর কি। হা! হা! যা হউক, ইঁদুর ভায়া সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে, শেষ রাত্রে ফাঁদে পড়েছেন। হা! হা! হা!

বিলা। এ সব, ভাই, তোরই কৌশলে ঘট্‌লো। যা হউক, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ। তবে কি না, মহারাজের চোক্ ছুটী যে এত দিনে খুল্‌লো, এও আহ্লাদের বিষয়।

রাজা। এ দুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে লজ্জা হয়! কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

নেপথ্যে। (রণবাদ্য) (মহারাজের জয় হউক) (রাজকুমারের জয় হউক)।

রাজা। (সচকিতে) বোধ হয়, কুমার ধনকুলসিংহ এসে উপস্থিত হলেন। প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন যেতে হলো।

বিলা। সে কি, মহারাজ? এত শীঘ্র? তবে আবার কখন দেখা হবে, বলুন্?

রাজা। তা ভাই, কেমন করে বল্‌বো? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা কর্‌বো। যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, এক একবার মনে করো, আর অধিক কি বল্‌বো।

বিলা। (নিরুত্তরে রোদন।)

মদ। (সজল নয়নে) বালাই, মহারাজ, এমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে!

রাজা। সখি, এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়-কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে! সে যা হউক। এখন এসো, বিলাসবতি, আমাকে হাস্যমুখে বিদায় দাও এসে।

মদ। এসো, সখি, মহারাজের সঙ্গে দ্বারপর্য্যন্ত যাই। আর কাঁদলে কি হবে, ভাই? এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে, মহারাজ যেন ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে এসেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ সম্মুখে দেবালয়। দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী এবং মদনিকা।

মদ। আর কেন, সখি? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্‌গে, বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর এখানে থাক্‌লে লোকে বল্‌বে কি?

নেপথ্যে। (রণবাদ্য।)

বিলা। ঐ শোন্ লো, শোন্! মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আস্‌চেন।

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে! ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, কে আস্‌চে?

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ? আমি ত কাকেও দেখ্‌তে পাচ্চি না।

মদ। এখন, ভাই, কাঁদলে আর কি হবে? ঐ দেখ, মন্ত্রী-মহাশয় আস্‌চেন।

(নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়, একটা তুচ্ছ অগ্নিকণা এ ঘোরতর দাবানল হয়ে জ্বলে উঠ্‌লো! আহা, এতে যে কত সুন্দর তরু আর কত পশু পক্ষী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলস্রোতঃ যখন পর্ব্বত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ করা কার সাধ্য? (নেপথ্যাভিমুখে) এ কি? অর্জ্জুনসিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে?

নেপথ্যে। আজ্ঞা, এই আমরা চল্‌লেম আর কি।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই? এ কি? এ সব ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে?

নেপথ্যে। মহাশয়, গরু পাওয়া ভার।

মন্ত্রী। (কর্ণ দিয়া) অ্যাঁ———কি বল্‌লে? গরু পাওয়া ভার! কি সর্ব্বনাশ! তোমরা তবে কি কত্যে আছ?

নেপথ্যে। উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ী গুলন্ যুতে ফেল।

ঐ। আজ্ঞা, এই হলো আর কি?

ঐ। ও হে বাদ্যকরেরা, তোমরা ঘুমুতে লাগ্‌লে নাকি? বাজাও! বাজাও।

ঐ। মহাশয়, আশীর্ব্বাদ করুন্, এই আমরা চল্‌লেম। বাজাও হে, বাজাও।

ঐ। (রণবাদ্য) মহারাজের জয় হউক!

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখি গে, আর কোন্ দল কোথায় কি কচ্যে? আঃ, এ সব কি একজন হতে হয়ে উঠে? ভগবান্ সহস্রলোচন পারেন কি না, সন্দেহ; আমার ত দুই চক্ষুঃ বৈ নয়!

[প্রস্থান।

বিলা। মদনিকে, চল, ভাই, আমরা ওই ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট যাই।

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে নাকি? চল বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হলো। এখন রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে গা শীতল কচ্যে। তা আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মন আছে?

মদ। হা! হা! হা! তুমি, ভাই, কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্যে মরি? হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর

বাঁচে না। হা! হা! হা! ওহে রাধে! এ যমুনা পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুব্জা সুন্দরীকে লয়ে কেলি কচ্চেন। হা! হা! হা!

বিলা। ছি; যাও মেনে, ভাই! ও সব তামাসা এখন আর ভাল লাগে না।

মদ। এ কি? ধনদাস না?

(নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুখ ভোগ করে, অবশেষে অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর কুক্কুরের ন্যায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফির্‌তে হলো? তা তোমারই বা দোষ কি? আমারই কর্ম্মের দোষ। পাপকর্ম্মের প্রতিফল এই রূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মত্ত হলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হলে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে সুবর্ণ মৃগের অনুসরণ কত্যেন? এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্ম্ম করেছি, তার সংখ্যা নাই। (রোদন) প্রভু, আমার অশ্রুজল দিয়া তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! (রোদন) হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্ব্বে হতো, তবে কি আর আমার এ দুর্দ্দশা ঘট্‌তো।

মদ। আহা! সখি শুন্‌লে ত? দেখ, সখি, ধনদাসের দশা দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হচ্যে, তা আর কি বল্‌বো? তুমি, ভাই, এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা দুই কথা কয়ে আসি।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্তে লোকে কি না করে? কিন্তু সে ধন কারো সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটী যে লোকে কেন না বোঝে, এই আশ্চর্য্য। এই যে আমি এত করে

গাছি রত্নমালা গেঁথেছিলাম, সে গাছি এখন কোথায় গেলো? কে ভোগ কর্‌বে? হাঃ।

(মদনিকার প্রবেশ।)

মদ। ধনদাস যে।

ধন। অ্যাঁ—কেন—কে ও? মদনিকা? (স্বগত) আরো কি যন্ত্রণা বাকি আছে? (প্রকাশে) দেখ, ভাই, আমি যত দূর দণ্ড পেতে হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার—

মদ। না, না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ কর্‌বোনা। তোমার দুঃখে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বল্‌বো? ধনদাস, আমি, ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখ্‌লে আমার মনে বেদনা হয়। তা, ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটি দিলেম।

ধন। (সচকিতে) আঃ, এ অঙ্গুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলে?

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে! এখন ভুলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈষৎ হাস্য।)

ধন। অ্যাঁ—কাকে বল্‌লে, ভাই?

মদ। মদনমোহনকে—যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়ে ছিল। আজ্‌ তা হলো ত? এই দেখ—আমিই সেই, মদনিকা।

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে?

মদ। আর কেমন করে বল্‌বো? আমি না হলে এ সকল

ঘটনা ঘটায় কে? ধনদাস, তুমি ভেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত্ত আর নাই; কিন্তু এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে? ভেবে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কত বড় দুষ্ট ছিলে! সে যা হউক, ঢের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে দুষ্ট বুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে এসো। দেখি, আমি যাকে ভেঙেচি, তাকে আবার গড়্‌তে পারি কি না।

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই, আমি অবাক্ হয়েচি! তুমিই তবে সেই মদনমোহন? কি আশ্চর্য্য!—আমি কি কিছুমাত্র চিন্‌তে পারি নাই?

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে, ভাই, আর পিরীতের কথার নামও করো না। আর দেখ, এ জন্মে কাকেও মেয়েমানুষ বলে অবহেলা করোনা। তার ফল ত দেখ্‌লে? কি বল? হা! হা! হা! (বিলাসবতীর প্রতি) এসো, সখি, তুমি একবার নেবে এসো। আমার ভারি খিদে পেয়েছে। চল হে, ধনদাস, চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর রাজগৃহ।

(রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ কর্‌বেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার কর্‌বেন। রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ।

রাজা। (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত) বটে? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব বলে থাকে? (ললাটে করপ্রহার করিয়া) হায়! হায়! মৃতদেহে কে না খড়্গ প্রহার কত্যে পারে? আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হলে কি আর এঁরা এত দর্প কত্যে পার্‌তেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থ শূন্য; সৈন্য বীরশূন্য, সুতরাং আমি অভিমন্যুর মতন এসপ্ত রথীর মধ্যে যেন নিরস্ত্র হয়ে রয়েছি; তা আমার সর্ব্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।— হে বিধাতঃ, এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কত্যে হবে? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস কর্‌বেন?

মন্ত্রী। মহারাজ আপনি এত চঞ্চল হলে————

রাজা। (সরোষে) বল কি, সত্যদাস? এ সকল কথা শুনে, স্থির হয়ে থাকা যায়? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান্? আর রাজা জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিস্মৃত হলেন, এ ও বড় আশ্চর্য্য! (পরিক্রমণ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! একি রাগের সময়? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরীদলকে কটূক্তিতে বিরক্ত করা উচিত? (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা বিধাতঃ; কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিভ্রাট ঘট্‌বে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সত্যদাস, বসো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ, (উপবেশন।)

রাজা। এখন এতে কি কর্ত্তব্য, তা বল দেখি? আমি ত কোন দিকেই এ বিপদ্ সাগরের কূল দেখ্‌তে পাচ্চি না। (দীর্ঘনিশ্বাস) মন্ত্রি, এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে সুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন, বল দেখি! এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো! হায়! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন! এ কৃষ্ণা আমার গৃহে কেন জন্মেছিল? হায়!

মন্ত্রী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্ব্বকালে আপন কুল মান রক্ষার্থে যা যা কীর্ত্তি করে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না?

রাজা। সত্যদাস, তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়্‌লে, সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ বোধ হয়; ও সব পূর্ব্বকথা মনে হলে কি আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে——

মন্ত্রী। মহারাজ——

রাজা। হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ করে; কিন্তু সিংহের কি সে রীতি?

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত?

বলে। (উপবেশন করিয়া) আজ্ঞা, হাঁ, মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে। যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী, উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন।

রাজা। সে কি? আমীর না ধনকুলসিংহের দলে ছিলেন?

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনায় ধনকুলসিংহের প্রাণ নাশ করে, এখন্ আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন।

রাজা। আঁ! বল কি? আহাহা! আমি দেখ্‌ছি, বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত!

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই; ভারতবর্ষে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে।

রাজা। জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি।

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহও প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন কচ্যেন। আর অনেক অনেক রাজবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন।

মন্ত্রী। হায়! হায়! এ সমরের কথা শুন্‌লে যে কত দিক থেকে কত লোক গর্জ্জে উঠ্‌বে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে সাগরের তরঙ্গ সমূহ কখনই শান্তভাবে থাকে না।

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্ত্তব্য? তুমি কি বল, বলেন্দ্র?

বলে। আজ্ঞা, আর কি বল্‌বো? মহারাজের কিম্বা স্বদেশের হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও

আমি প্রস্তুত আছি। তবে কিনা, এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। যা হোক, যে পর্য্যন্ত আমার কায় প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্নে কখনই বিরত হবো না। এখন দেবতারা——

রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে দেবতারা মানবজাতির দুঃখে দুঃখী হবেন। দুরন্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তর্হিত হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি বলে।

বলে। যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হলে, না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তা ভাই, আর দেখ্‌তে হবে কেন? বুঝেই দেখ না, যদি কোন ব্যক্তি 'বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন, দেখি,' এই বলে কোন উচ্চ পর্ব্বত থেকে লাফ দেয়; কিম্বা জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে, তা হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখিছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়।

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবু,————

মন্ত্রী। (বলেন্দ্রের প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন দেখি। (পত্রপ্রদান।)

রাজা। ও কি পত্র, মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ, এ পত্রখানি আমি গতরাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কে কোথ্‌ থেকে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই পাচ্চি না।

বলে। কি সর্ব্বনাশ! রাম, রাম, রাম, রাম,!——এমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে!

রাজা। কেন, ভাই, বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি, শুনি?

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্যে পারি না,

যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণ-গোচর করা আমার সাধ্য নয়। (রাজাকে পত্র-প্রদান।)

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু———

বলে। রাম! রাম! আর ও কথায় প্রয়োজন কি? রাম, রাম! এ ও কি কথা! ছি, ছি, ছি!

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) তা—বলি—বলি—এ উপায় ভিন্ন আর যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন——

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি। মহাশয়, একি মনুষ্যের কর্ম্ম?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল মান রক্ষা করা মানবজাতির প্রধান কর্ম্ম। বিশেষতঃ ক্ষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন্।

রাজা। (ক্ষণৈক নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) মন্ত্রি,———

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। এ পত্র খানি তোমাকে কে লিখেছে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বল্‌তে পারি না।

রাজা। দেখ, মন্ত্রি, এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ দেখ্‌চি, রোগ নিরাকরণ কর্ত্তে সুনিপুণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস এবং নীরবে অবস্থান।)

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ! আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিন্ন আর কোন ঔষধ নাই।

রাজা। বলেন্দ্র,———

বলে। আজ্ঞা———

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) ভাই, কি হবে?

বলে। আজ্ঞা, এ পত্র খানি আমাকে দেন, আমি ছিঁড়ে

ফেলি। এ যে শক্রর লিপি, তার কোন সন্দেহ নাই। কি সর্ব্ব-নাশ!

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদকাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ বিদীর্ণ করেও দেবপূজায় রক্তদান করে থাকে।

রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে আর এ কর্ম্মেতে অনেক পৃথক্।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, এ সময়ে সর্ব্বনাশ হবার সম্ভাবনা; তা সর্ব্বনাশ অপেক্ষা——

রাজা। সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হয়, আর চতুর্দ্দিক্ যেন অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলো! হা পরমেশ্বর!—না, না, না,—এ ও কি হয়?—

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন। কত শত রাজসতী এই বংশের মান রক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করেছেন; বিশেষতঃ যিনি নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতা-স্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহস্র জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত?

রাজা। হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা বলে আমি কি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সম্মত হতে পারি? আর রাজমহিষী এ কথা শুন্‌লেই বা কি বল্‌বেন? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম; সুতরাং আমরা অনেক সহ্য কত্যে পারি; কিন্তু———

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি একথা কেমন করে টের পাবেন?

রাজা। সত্যদাস, এ কথা কি গোপনে থাক্‌বে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাক্‌তে পারে। তবে কি না এটা একবার চুকে গেলে আর ততো ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই আবার সেই

শোককে অল্পজীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।—না,—তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ্ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সর্ব্বনাশ। উঃ—না,—না, (গাত্রোত্থান) তা বলে কি আমি এ কর্ম্মে সম্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কর্ম্ম চণ্ডালেও কত্যে পারে না। আর চণ্ডাল ত মনুষ্য, এমন কর্ম্ম পশু পক্ষীরাও কত্যে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণযত্নে প্রতিপালন করে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, এ তর্ক বিতর্কের বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, বীরবর?

বলে। আমি এতে আর কি বল্‌বো?

রাজা। বলেন্দ্র, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা করে আমার স্নেহপুত্তলিকা কৃষ্ণার প্রাণনাশ কত্যে সম্মত হতে পারি? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপত্যস্নেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে উঠে, তার আর কি বল্‌বো? উঃ—(বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান) হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে? আহা! এমন সরলা বালা!—আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে——আহা! ও মা কৃষ্ণা—আঃ—(মূর্চ্ছা প্রাপ্তি।)

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হায়, এ কি হলো?———কি হবে? এখানে কে আছে রে?

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি?——মহারাজ!——এ কি?

মন্ত্রী। বীরবর, এ দেখ্‌ছি, বিষম বিপদ্ উপস্থিত। তা আসুন্, আমরা মহারাজকে এখানে থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আন্‌গে যা।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন্।

[রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর—একলিঙ্গের মন্দির সম্মুখে।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। (স্বগত) উঃ, কি অন্ধকার! আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কি ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত ভূত, কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে। মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্যি না। (সচকিতে) ও বাবা! ও কিও? তবে ভাল!—একটা পেঁচা! আমার প্রাণটা একবারে উড়ে গেছলো! শুনেছি, পেঁচা গুলো ভুতুড়ে পাখী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগ্‌বে। দূর! দূর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! আজ ক দিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আহার, নিদ্রা, রাজকর্ম্ম, সকলই একবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর

সর্ব্বদাই "হে বিধাতঃ, আমার কপালে কি এই ছিল! হা! বৎসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো!" কেবল এই সকল কথাই ওঁর মুখে শুন্‌তে পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ—সচকিতে) ও আবার কি? লম্বা যেন তালগাছ! ও বাবা! কি সর্ব্বনাশ! এ কি নন্দী না ভৃঙ্গী, না বীরভদ্র? বুঝি বীরভদ্রই হবে! তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে! উঃ। ও বাবা! এই দিকেই যে আস্‌চে।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

কে ও? ও! রঘুবর সিংহ! আঃ! বাঁচলেম। আমি, ভাই, তোমাকে বীরভদ্র ভেবে পলাতে উদ্যত হয়েছিলাম। তা তুমিও প্রায় বীরভদ্র বট!

রক্ষ। চুপ্ কর হে। এত চেঁচিয়ে কথা কইও না।

ভৃত্য। কেন? কেন? কি হয়েছে?

রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যন্ত শঙ্কটে পড়েছেন; বাঁচেন কি না সন্দেহ।

ভৃত্য। বল কি, রঘুবর সিংহ?

রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূর্চ্ছা যাচ্যেন। ভগবান্ শম্ভুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধ পত্র দিচ্যেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌চে না। আহাঃ, মহারাজের দুঃখ দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়। আর রাজকুমার বলেন্দ্রও, দেখ্‌চি, অত্যন্ত কাতর। দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই। দুই জনে যেন এক প্রাণ।

ভৃত্য। তার সন্দেহ কি?

রক্ষ। তুমি ত, ভাই, সর্ব্বদাই মহারাজের কাছে থাক। তা মহারাজের এমন হবার কারণ টা কিছু বুঝ্‌তে পার?

ভৃত্য। কৈ, না! কেন? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে থাক। তা তুমি কি কিছু জান না?

রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারি না! তবে অনুমানে বোধ হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ; দেখ, এ কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্ব্বদা তাঁরই নাম শুন্‌তে পাই।

ভৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের মুখে তাই শুনি।

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ; এ কি আমার কর্ম্ম; হস্তী সুকুমার কুসুমকে দলন করে ফেলে বটে? তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপ লাবণ্য গুণবিষয়ে তার চক্ষুঃ অন্ধ। কিন্তু মনুষ্য কি কখন পশুর কাজ কত্যে পারে? না, না, এ আমার কর্ম্ম নয়। আমার এখনি এ স্থান হতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। (প্রকাশে) রঘুবর সিংহ?

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি!

বলে। শীঘ্র আমার ঘোড়া আন্‌তে বলো।

রক্ষ। যে আজ্ঞা! (ভৃত্যের প্রতি) ওহে, বড় অন্ধকার টা হয়েছে; এসো না, ভাই, আমরা দুজনেই যাই।

ভৃত্য। আচ্ছা, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, রক্ষা করুন্, আর কি বল্‌বো? আপনি এত বিরক্ত হলে সর্ব্বনাশ হয়! আসুন, মহারাজ আপনাকে আবার ডাক্‌ছেন।

বলে। (হস্ত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি, মন্ত্রি? আমি কি চণ্ডাল? না পাষণ্ড? এ কি আমার কর্ম্ম? এ কলঙ্কসাগরে

মহারাজ আমাকে কেন মগ্ন কত্যে চান? অ্যাঁ? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো, বল দেখি? কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্তলিকা। আমি কেমন করে নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট করি?—ঐহিক সুখের জন্যে লোক পরকাল নষ্ট করে; কেননা, পরকালে যে কি ঘট্‌বে, তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কর্ম্মের প্রতিফল কি ইহকালেও ভোগ কত্যে হয় না?—মন্ত্রি, তুমি এ ঘৃণাস্পদ কর্ম্ম কত্যে আমাকে আর অনুরোধ করো না।

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আসুন। এ সব কথার যোগ্য স্থল এ নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(চারিজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ ভোলানাথ! (সকলের উপবেশন এবং শিবস্তব গাতান্তে) বোম্ মহাদেব!

প্রথম। গোঁসাই জি, আপনি যে বল্‌ছিলেন, অদ্য রাত্রে মহারাজের কোন বিপদ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জান্‌তে পার্‌লেন?

দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্ত্তব্য। অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখ্‌লেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়্‌ছে! কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল হতে একটা রক্তস্রোতঃ নির্গত হচ্যে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখ্‌লেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচ্যেন, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্যেন। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে যেন কোন বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত হবে তার সন্দেহ নাই।

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না।

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্ব্বন্ধ তা অবশ্যই ঘটবে; অতএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হবে। আর কোন উপকার নাই।

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ ঘটতে পারে?

দ্বিতীয়। তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই জানেন। আমার অনুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘট্‌তে পারে। যা হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই! এক্ষণে চল, আমরা এস্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি ত্বরায় একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হবে।

সকলে। বোম কেদার! হর-হর-হর! বোম-বোম-বোম!

[সকলের প্রস্থান।

(বলেন্দ্র এবং মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ।)

মন্ত্রী। রাজকুমার, পিতৃসত্যপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য। তা মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোনমতেই উচিত হয় না।

বলে। আর ও সব কথায় আবশ্যক কি? আমি যখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাক্‌বে?

বলে। দেখ, মন্ত্রি, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে এমন কেন ঘটলে?

অবশ্য আমার পূর্ব্ব জন্মে কোন পাপ ছিল; তা না হলে—
(নেপথ্যে) বীরবর, আপনার ঘোড়া প্রস্তুত!

বলে। আচ্ছা। আমি চল্‌লেম, মন্ত্রি।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) রাজকুমার যে এ দুরূহ কর্ম্মে সম্মত হবেন এমন ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হউক, এখন বহু কষ্টে সম্মত হলেন। আহা! রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা।

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। সত্যদাস, বলেন্দ্র কি গেছে? হায়, হায়! হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে? বাছা, আমি কি আর তোমার সে চন্দ্রানন দেখ্‌তে পাব না? হায়, হায়! ছিঃ, আমি কি পাষণ্ড! নরাধম———

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন চলুন্, রাজপুরে চলুন্।

রাজা। সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবো?

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার,———

রাজা। সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধর্ম্মাবতার বল? আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। আমি স্বয়ং কলি অবতার।

মন্ত্রী। মহারাজ এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়!

(ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জ্জন।)

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ

করে, চামুণ্ডা-রূপে গর্জ্জন কচ্যেন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ তুমি কি আমাকে গ্রাস কত্যে উদ্যত হয়েছো? উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তমান্ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্যেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! এ কি প্রলয় কাল! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না? (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ? বিনাশ কর।—কৈ? এখনও বজ্রাঘাত হলো না?—কৈ? বিলম্ব কেন। (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই নেও!—এই নেও! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ? বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্যেন নাকি? (বিকট হাস্য।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি বিপদ্ উপস্থিত! মহারাজ যে ক্ষিপ্ত প্রায় হলেন্। (প্রকাশে) মহারাজ, আপনিও কি করেন? আসুন, এক্ষণে রাজপুরে যাই।

রাজা। (না শুনিয়া) পরমেশ্বর কি কল্যে?—মৃত্যু হবে না? কেন হবে না? কেন?—কেন?—অ্যাঁ! কি হবে? তবে কি হবে?—আমার কি হবে? (রোদন।)

মন্ত্রী। (স্বগত) একি সর্ব্বনাশ! এখন কি করি? এঁকে লয়ে যাবার উপায় কি?

রাজা। এ কি? ও মা কৃষ্ণা! কেন, মা?—এস, এস, একবার তোমার মস্তক চুম্বন করি। তোমার কি হয়েছে, মা?—আহা!—আমি যে তোমার দুঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভাল বাস্তে।—(রোদন) ও কি ভাই বলেন্দ্র? ও কি?—ও কি?—কি কর?—কি কর? এমন কর্ম্ম—ওঃ—(মূর্চ্ছা প্রাপ্তি)

মন্ত্রী। (স্বগত) একি? একি? এ কি সর্ব্বনাশ!—কি হবে? এখানে যে কেউ নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস্ রে!

(ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ।)

ভৃত্য। একি?——কি সর্ব্বনাশ।

মন্ত্রী। ধর, ধর, মহারাজকে শীঘ্র রাজপুরে লয়ে চল।

[রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর—কৃষ্ণকুমারীর মন্দির।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ।

অহ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ভগবতি, কৈ, আমার কৃষ্ণা ত এখানে নাই?

তপ। বোধ করি, তবে রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই। তা আপনি এত উতলা হলেন কেন?

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি! ও কি মহিষি? স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়? তা হলে এ পৃথিবীতে যে কত শত দরিদ্র রাজা হতো; আর কত শত রাজা দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই। কত লোক যে কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সত্য হয়?

অহ। ভগবতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্যে; আপনি আবার কৃষ্ণাকে ডাকুন। আমি একবার তাঁর চাঁদবদন খানি ভাল করে দেখি। (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। আপনি এমন কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি।

অহ। ভগবতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরে উঠে! (রোদন।)

তপ। কেন, বৃত্তান্তটাই কি?

অহ। আমার বোধ হলো, যেন আমি ঐ দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে এক জন ভীমরূপী বীরপুরুষ এক-খান অসি হস্তে করে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্যে——

তপ। কি আশ্চর্য্য! তার পর?

অহ। আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে। আর ঐ বীরপুরুষ কল্যে কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এসে তাকে খড়্গাঘাত কত্যে উদ্যত হলো; আমি ভয়ে অমনি চীৎকার করে উঠ্‌লেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে, বল্‌তে পারি না। (রোদন।)

তপ। আপনি কি জানেন্ না, মহিষি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখ্‌লে ভাল হয়, আর ভাল দেখ্‌লে মন্দ হয়?

অহ। সে যা হৌক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে শুতে দেবো না।

তপ। (সহাস্য বদনে) কেন মহিষি, তাতে দোষ কি? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ঐ শুনুন্! আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় আছেন। তা চলুন, আমরা সেখানেই যাই। মহিষি, আপনি কৃষ্ণার সম্মুখে কোনমতেই এত উতলা হবেন না। মেয়েটী আপনাকে এ অবস্থায় দেখ্‌লে অত্যন্ত বিষণ্ণ হবে। তা তাকে আর কেন বৃথা মনঃপীড়া দেবেন? আর বিবেচনা করে দেখুন না কেন, স্বপ্ন নিদ্রাদেবীর ইন্দ্রজাল বৈত নয়। চলুন, আমরা এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(খড়্গহস্তে বলেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ্ প্রবেশ কত্যে যেন

আমার পা আর উঠ্‌তে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন শিঁদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীরপুরুষের ধর্ম্ম? হায়! মহারাজ কেন আমাকে এ বিষম ঝনৃঝটে ফেল্‌লেন? এ নিদারুণ কর্ম্ম কি অন্য কারো দ্বারা হতে পার্‌তো না? ইচ্ছা করে যে কৃষ্ণাকে না মেরে আপনিই মরি! (দীর্ঘ নিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন, ফল দর্শাবে না? (শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া) কৈ? কৃষ্ণা ত এখানে নাই। বোধ হয়, এখনও শুতে আসে নাই। তা এখন কি করি? (পরিক্রমণ।) (নেপথ্যে গীত।) (স্বগত) আহা! হে বিধাতঃ, আমি কি এমন কোকিলাকে চির-কালের জন্যে নীরব কত্যে এলেম? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আস্‌ছেন! হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজবংশের প্রতি এত প্রতিকূল হলে! এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ কর্‌বে! হায়, হায়! বৎসে, তুমি কেন এ নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রের গ্রাসে পড়্‌তে আস্‌চো! (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(কৃষ্ণার সহিত তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ।)

তপ। বাছা, এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি গান বাদ্যেতে মত্ত থাক্‌তে হয়? যাও, রাজমহিষী যে শয়ন মন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করগে, আর বিলম্ব করো না।

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখ্‌লেম কেন, বলুন্ দেখি? উনি আমাকে আজ্ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা কর্‌ছিলেন কেন?

তপ। রাজনন্দিনি, একে ত মায়ের প্রাণ; তাতে আবার তুমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে? আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে——

কৃষ্ণা। (সহাস্য বদনে) তবে মা কি ভাবেন, যে আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি করে নে যাবে?

ভপ। বৎসে, তাও কি কখন হয়! চন্দ্রলোক থেকে অমৃত অপহরণ করা কি যার তার সাধ্য।

কৃষ্ণা। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঃ, ভগবতি, দেখুন, কি অন্ধকার রাত্রি। নিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভূষা পরিত্যাগ করে দুঃখসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

ভপ। (সহাস্য বদনে) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোৎ থেকে শিখ্‌লে! যাও, শয়ন করগে। আমিও এখন কুটীরে যাই। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হলো।

কৃষ্ণা। যে আজ্ঞা।

ভপ। তবে আমি এখন আসি গে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরে ছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি, যে তিনি নাকি আবার অনেক সৈন্য সামন্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উদ্যোগে আছেন;—তা দেখি, বিধাতা আমার কপালে কি করেন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) সুভদ্রার জন্যে অর্জ্জুন যেমন যদুকুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠ্‌লো। (গবাক্ষ খুলিয়া) ইঃ, কি ভয়ানক বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়কালের বিস্ফুলিঙ্গ পাপাত্মার অন্বেষণে পৃথিবী পর্য্যটন কচ্যে। আর মেঘের গর্জ্জন শুন্‌লে মহামহাবীর পুরুষেরও হৃৎকম্প হয়। উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্যে। আজ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত? এ মন্দির পর্ব্বতের ন্যায় অটল; প্রবল ঝড় হইলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্যে! আহা! পরমেশ্বর

তাদের রক্ষা করুন। হে বিধাতঃ, সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব্ব উচ্চ সুবর্ণ অট্টালিকায় ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ কচ্যে, আর কেউ বা আশ্রয় বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে। কিন্তু তাও বলি, অট্টালিকায় বাস কল্যেই যে লোকে সুখী হয়, এমন নয়। আমার ত কিছুরই অভাব নাই, তবে কেন আমি সুখী হই না? মনের সুখই সুখ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন? পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগ্‌চে না। আমার মনঃ যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি দেকি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হতে পারি। তাই যাই। হে মহাদেব, এ অধিনীর প্রতি দয়া করে এর মনের চঞ্চলতা দূর কর। প্রভু, এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাগত। (শয়ন।)

(বলেন্দ্রসিংহের পুনঃ প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) হায়! হায়! আমি এমন কর্ম্ম কত্যে এলেম, যে পাছে একবারে রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদ ক্ষেপণ কত্যেও আশঙ্কা হচ্যে। আমার এমনি বোধ হচ্যে যেন পদে পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কত্যে আস্‌চে। তা হলেও এক প্রকার ভাল হয়। রজনি দেবি, তুমিই আমার সাক্ষী। আমি এ কর্ম্ম আপন ইচ্ছায় কচ্যি না। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) হায়! হায়! আমি এ রাজকুলমৃণাল থেকে এ প্রফুল্ল কনক পদ্মটি যথার্থই কি ছিন্ন ভিন্ন কত্যে এলেম! এমন সুবর্ণমন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে! (চিন্তা করিয়া) তা কি করি? জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

আমার দেখ্‌ছি মারীচরাক্ষসের দশা ঘট্‌লো, কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই! তা জন্মের মতন বাছার চন্দ্রবদন খানি এক-বার দেখে নি! (মুখ দেখিয়া) হে বিধাতঃ, আমি কি রাহু হয়ে এমন পূর্ণশশীকে গ্রাস কত্তে এলেম? আমি কি প্রল-য়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিত্তে জলমগ্ন কত্তে এলেম। (নয়ন মার্জ্জন) আহা মা! আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কত্তে এসেছি। আহা! বাছা এখন নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্চ্যেন; আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্নদ্বারা পরম সুখানুভব কচ্চ্যেন; কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্যস্বরূপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে আমি এত প্রাণতুল্য ভাল বাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিনহৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কত্তে হলো। বলেন্দ্রের অস্ত্রে কি শেষে এই কীর্ত্তি হলো? ধিক্! ধিক্! (চিন্তা করিয়া) তবে আর কেন?—ওঃ! এ স্নেহনিগড় ভগ্ন করা কি মনুষ্যের কর্ম্ম? দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় একে যত খোল, ততই বাড়ে! হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী। হে রজনী দেবি, তুমি সাক্ষী। (মারিতে হস্ত উত্তোলন।)

কৃষ্ণা। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) অঁ্যা—অঁ্যা—কাকা! এ কি? এ কি?

বলে। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ।)

কৃষ্ণা। অঁ্যা—কাকা! এ কি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন?

বলে। না, এমন সময় কিছু নয়! কেবল তোমাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি? তা বৎসে! তা বৎসে! আমাকে বিদায় দেও। আমি চল্যেম।

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি একজন মহাবীর পুরুষ; তা আপনার কি এ দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত?

বলে। (বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন।)

কৃষ্ণা। (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি? (অসি বক্ষঃস্থলে গোপন ও প্রকাশে) কাকা, আমি আপনার পায়ে ধচ্যি, আপনি আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন।

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না। আমি ত তোমার কাকা নই, আমি চণ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম। (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি, কাকা?

বলে। হা আমার কুললক্ষ্মী!—হে পৃথিবি, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর! (রোদন।)

কৃষ্ণা। (হস্ত ধারণ) কেন, কাকা আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন?

বলে। কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কত্যে এসেছিলাম।

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি?

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা! তুমি কি অপরাধ কাকে বলে, তা জান? (রোদন) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ, উভয়েই এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তোমাকে বিবাহ কর্‌বেন, নয় উদয়পুরীকে ভস্মরাশি কর্য্যে এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড কর্‌বেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা তা ত তুমি বিলক্ষণ জান! এই জন্যেই——

কৃষ্ণা। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা, যে——

বলে। মা, আমি আর কি বল্‌বো? তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম্ম কত্যে প্রবৃত্ত হই?

কৃষ্ণা। বটে? তা এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচ্যেন

কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মতন বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীর-কেশরী। আপনার ভাইঝি। আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন্! কাকা, একবার ঐ দুয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন। আহা! কি অপরূপ রূপ লাবণ্য! উনিই পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর একবার দেখা দিয়ে ছিলেন; জননি, তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ মন্দির সহসা নন্দনকাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য!

নেপ। (পদশব্দ।)

বলে। এ কি? এ কি?

(রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ অবলোকন)।

মন্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, তবে এখনও হয় নাই। আঃ! রক্ষা হউক! (অগ্রসর হইয়া বলেন্দ্রের প্রতি জনান্তিকে) রাজকুমার, আর দেখেন কি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত! মহারাজ হঠাৎ উন্মাদ প্রায় হয়েছেন।

বলে। সে কি? সর্ব্বনাশ! (রাজার নিরাসনে উপবেশন।) হায়, হায়, কি হলো! তা মন্ত্রি, তুমি ওঁকে এখানে আন্‌লে কেন?

মন্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। সুতরাং, আমাকে ওঁর সঙ্গে আস্‌তে হলো। কি জানি, যদি অন্য কোথাও যান। আর একটা ভাবলেম, যে মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপকর্ম্মে প্রয়োজন কি? তাই আপনাকে নিবেদন কত্যে এলেম। এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে।—হায়, হায়, রাজকুমার——

রাজা। বলেন্দ্র! ছি ভাই! এমন কর্ম্মও করে। (গাত্রোত্থান করিতে করিতে) কর কি, কর কি? না,—না, না, না,—মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ! হুঁঃ! তাঁকে তো এখনই নষ্ট কর্‌বো। আমি এই চল্যেম। (কিঞ্চিৎ গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা! কেন, মা? কেন?—মা, একবার বীণাধ্বনি কর—মা, একটি গান কর।—আহাহা—ঐ, ঐ, হা আমার কুললক্ষ্মী! তুমি কোথা গেলে! (রোদন।)

কৃষ্ণা। (রাজার অবস্থাকে শোকজ্ঞান করিয়া) কাকা, পিতা এমন কচ্যেন কেন? পিতঃ, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন? জীব মাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম্ম আছে? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন্! রাজসতী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন! উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে "কুলমান রক্ষার জন্যে যে যুবতী আপন প্রাণদান করে, স্বরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" পিতঃ, আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন! এই অন্তকালে যে মায়ের পা দুখানি দেখ্‌তে পেলেম না, এই একটা বড় দুঃখ মনে রৈল! (রোদন।)

বলে। ছি, মা, ছি! তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না! তোমার শত্রুর অন্তকাল উপস্থিত হউক।

কৃষ্ণা। কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু, আবার কোন কোন তরুর কাষ্ঠে দেব প্রতিমা নির্ম্মাণ হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্যে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়।

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও না। তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমার অপেক্ষা কি এ রাজপদ প্রিয়তর?

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আন্‌বেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভাল বাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে আমাকে বিদায় দেন! পিতঃ, আপনি নরপতি; বিধাতা আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কর্ত্তে এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন; তা আপনার তাদের সুখ দুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন? আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আর আমার সঙ্গে কথা কবেন না? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এই বার শেষ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ ভবযন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়ে সুরপুরীতে যেতে পারি। (চরণে পতন।)

রাজা। এ না মানসিংহের দূত?—এত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে?

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেন, পিতঃ, আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি?

রাজা। কি অপরাধ?—আমার নিকটে ছলনা? দূর হঃ, দূর হঃ!

মন্ত্রী। এ কি সর্ব্বনাশ!—

কৃষ্ণা। হা বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এ সময়ে পিতাও কি বিমুখ হলেন? কাকা, আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি, যে উনি আমার প্রতি বিরক্ত হলেন? (আকাশে কোমল বাদ্য) আঃ, আমি এই যাই।—কাকা, আপনার চরণে ধরি (চরণে পতন) আপনিই আমাকে বিদায় দেন।

বলে। উঠ মা, উঠ! ছি, মা, ছি! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমাকে বিদায়—(আকাশে কোমল বাদ্য।)

কৃষ্ণা। জননি, এই আমি এলেম। (সহসা খড়্গাঘাত ও শয্যোপরি পতন।)

সকলে। এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! হে পরমেশ্বর আমাদের কি কর্‌লে? বৎসে, তুমি কি আমাদের যথার্থ ত্যাগ কর্‌লে! হায়, হায়! (রোদন।)

(তপস্বিনীর প্রবেশ।

তপ। এ কি? (অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ রাজকুললক্ষ্মী এ অবস্থায় কেন? হায়, হায়! এ রত্নদীপ কে নির্ব্বাণ কল্যে?—হায়, হায়! (রোদন।)

বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে! এ দিকে এই, আবার ও দিকে মহারাজের দশা দেখেছেন? আহাহা! দাদা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! ভগবতি—

তপ। কেন, কেন? মহারাজের কি হয়েছে? উনি অমন কর্চ্যেন কেন?

বলে। আর ভগবতি, সকলই আমার অদৃষ্টে করে! মহারাজ হঠাৎ মহা উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

তপ। কেন? কারণ কি?

(অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ।)

অহ। (নেপথ্য হইতে) কৈ? কৈ? আমার কৃষ্ণা কোথায়? (অবলোকন করিয়া) এ কি? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে

কেন!——অ্যাঁ!——এ যে রক্ত!—মহারাজ এমন কে কর্‌লে?

তপ। মহিষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্যেন? ওঁতে কি আর উনি আছেন?

অহ। তবে বুঝি উনিই এ কর্ম্ম করেছেন! ও মা, আমার কি সর্ব্বনাশ হলো! (কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন) আহা! বাছা আমার স্বর্ণ লতার ন্যায় পড়ে আছেন! ওমা কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা এসে ডাক্‌ছি যে। ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্যে, মা? উঠ, মা, উঠ। ওমা, ওমা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো? (রোদন।)

কৃষ্ণা। (মৃদুস্বরে) মা, এসেছো?—আমাকে পায়ের ধূল দেও। মা,—পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,—তুমি ওঁকে আমার সকল দোষ ক্ষমা কর্‌ত্যে বলো। মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দেও। মা, তোমার এ দুঃখিনী মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো (মৃত্যু—আকাশে কোমল বাদ্য।)

অহ। ওমা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা! (রোদন) একি? আবার যে মা আমার চুপ্‌ করলেন? ওমা, কৃষ্ণা! ওমা! ওমা! ওমা! (মূর্চ্ছা।)

তপ। এ আবার কি হলো?—রাজমহিষী যে হঠাৎ অচেতন হলেন। মহিষি, উঠুন, মহিষি, উঠুন, হায়, হায়! একবারে কি সব ছারখার হলো?

অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি স্বপ্ন——মহারাজ, এ কর্ম্ম কে কর্‌লে? ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন?—ও কি? (উঠিয়া) তোমরা যে সকলেই চুপ করে রৈলে?

১ | ভারতীয় আর্যভাষা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য
মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য
নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

(১) ভারতীয় আর্যভাষা : সংজ্ঞা

পণ্ডিতদের অনুমান, খ্রীষ্টজন্মের ১৫০০ বছর আগেই আর্যভাষা-ভাষী এক বা একাধিক গোষ্ঠী ভারতে আসে। ভারতে এসে এরা যে-ভাষা ব্যবহার করেছিল, তাকেই বলা হয় 'ভারতীয় আর্যভাষা'।

(২) ভারতীয় আর্যভাষার শ্রেণীবিভাগ

ভারতীয় আর্যভাষা

প্রাচীন ভারতীয় আর্য	মধ্যভারতীয় আর্য	নব্য বা আধুনিক ভারতীয় আর্য
(১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ—৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)	(৬০০ খ্রীঃ পূ—৯০০ খ্রীঃ)	(৯০০ খ্রীঃ—আজ পর্যন্ত)
(বৈদিক সংস্কৃত ভাষা)	(পালি - প্রাকৃত)	(বাংলা - হিন্দি - মারাঠী - পাঞ্জাবী প্রভৃতি)
(প্রাঃ ভাঃ আঃ)	(মঃ ভাঃ আঃ)	(নাঃ ভাঃ আঃ)
(OIA)	(MIA)	(NIA)

আর্যরা ভারতে আসে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তারা এদেশে এসে যে-ভাষা ব্যবহার করে, তার নাম 'ভারতীয় আর্যভাষা'। তাদের আগমনকাল থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় ৩৫০০ বছর ধরে ভারতে সেই 'ভারতীয় আর্যভাষা' নানা রূপের মধ্য দিয়ে আজও বর্তমান আছে। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসকে লক্ষণীয় পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি প্রধান যুগে বা স্তরে ভাগ করা হয় :

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (Old Indo-Aryan = সংক্ষেপে OIA)
২. মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan = MIA)
৩. নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan = NIA)।

(৩) এক। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক-সংস্কৃত) : সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সংজ্ঞা

পণ্ডিতদের অনুমান, আর্যরা ভারতে আসে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তারা এদেশে এসে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ও সাহিত্য-সৃষ্টিতে যে- ভাষা ব্যবহার করেছিল, তার নাম 'ভারতীয় আর্যভাষা'। মুখের ভাষা কালে কালে পাল্টে যায়, সেই পাল্টানোর নানা

লক্ষণও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নানা যুগের সাহিত্যে সেই পাল্টে যাওয়া ভাষার প্রমাণ আছে। ভারতীয় আর্যভাষাও ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত প্রধান তিনটি স্তরে বিবর্তিত হয়েছে—আদিস্তর, মধ্যস্তর ও অন্ত্যস্তর। ভাষাতাত্ত্বিকদের ভাষায়, সেই তিনটি স্তরের নাম 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য', 'মধ্যভারতীয় আর্য' ও 'নব্যভারতীয় আর্য'। সুতরাং আর্যরা ভারতে আসার দিন থেকে প্রথমস্তরে বা প্রথমযুগে যে-ভাষা ব্যবহার করেছিল, তাকেই বলা হয় 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা'।

❒ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিকাল

পণ্ডিতদের অনুমান, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিকাল হলো ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

❒ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন = ঋক্‌বেদ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান নিদর্শন হলো 'বেদ'। তবে, বেদের সবটা বা চারটি ভাগই (ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব) নয়—তার প্রথম ভাগ 'ঋকবেদ সংহিতা'ই হলো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সর্বাধিক প্রামাণ্য নিদর্শন।

❒ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা সাধারণ লক্ষণ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সুদীর্ঘকাল ধরে (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ—৬০০ খ্রীঃ পূঃ) ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ভাষায় 'ঋক্' বেদের মতো একটি গ্রন্থও রচিত হয়েছে। পণ্ডিতেরা এই ভাষার মধ্যে নানা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেছেন। তা থেকেই এই ভাষার স্বরূপটি নির্ণীত হলো :

❒ এক ❒ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি স্বরধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল। (বেদের পরবর্তী যুগে ছিল না, বা লোপ পেয়েছিল)
২. এই ভাষায় শ, ষ, স, ঃ প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল।
(বেদের পরবর্তীযুগে এগুলি ছিল না বা লোপ পেয়েছিল)
৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের আদি স্থান ছাড়া অন্যত্র বিবিধ যুক্ত-ব্যঞ্জনের প্রচুর ব্যবহার ছিল। যেমন :— ক্ত, ক্র, ক্ষ, ক্ষ্ম, ত্ব, দ্ব, ষ্ট্র, ক্স, র্ষ, প্র প্রভৃতি।
(বেদের পরবর্তীকালে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার সমীভূত হয়েছে— আরো পরে নব্য-ভারতীয়-আর্যে তা একক ব্যঞ্জনে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন— প্রা-ভা-আ কর্ম > ম-ভা-আ কম্ম > ন-ভা-আ কাম (কাজ)।
৪. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় যত্রতত্র সন্ধি লেগেই ছিল।
৫. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় এক বিশেষ শ্রেণীর স্বরাঘাত (Pitch accent) বর্তমান ছিল। কেউ কেউ বলেন, এই স্বরাঘাত দেবার প্রবণতাটি ছিল তিন রকম—'উচ্চ' বা 'উদাত্ত', 'নিম্ন' বা অনুদাত্ত এবং 'মধ্যম' বা 'স্বরিত'। একটি শব্দের অন্তর্গত যে-কোনো অক্ষরেই জোর দিয়ে উচ্চারণ করা যেতো। অর্থাৎ শব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধ্বনিতে বক্তার ইচ্ছানুসারে এই জোর বা স্বরাঘাত পড়তো। তাতে একটা অসুবিধাও ঘটতো। শব্দের প্রথম ধ্বনিতে জোর দিলে শব্দের যে মানে হতো, দ্বিতীয় ধ্বনিতে জোর দিলে সে-মানে আর থাকতো না,— মানে পাল্টে যেতো। ভাষাতাত্ত্বিক তার উদাহরণ দিয়েছেন— 'রাজপুত্র' শব্দটি। এতে 'রা'-এ জোর বা স্বরাঘাত দিলে (রাজপুত্র =) মানে

হয়— রাজা যার পুত্র (= রাজার বাবা)। কিন্তু 'ত্র'-তে জোর দিলে (রাজপুত্র —) মানে হয়— রাজার পুত্র (রাজার ছেলে)। (দ্রঃ Macdonell — A Vedic Grammar for Students, (1971), P. 455)। তেমনি— মাতৃ (= পরিমাপকারী), মাতৃ (= মা)।

৬. অনুরূপে স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনে শব্দের স্বরধ্বনিগুলিরও গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এই গুণ বৃদ্ধি সম্প্রসারণ তখনকার ভাষায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। যেমন—

'যজ্' ধাতুর তিনটি রূপ— যজ, যাগ, ইষ্ট।
'স্বপ্' ধাতুর তিনটি রূপ— স্বপ্ন, স্বাপ, সুপ্ত।

— এগুলিতে স্বরধ্বনিগুলির গুণ, বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটেছে।

৭. প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বর্ণমালায় প্রতিটি বর্গে একটি করে আনুনাসিক ধ্বনি আছে। যেমন— 'ক' বর্গে ঙ, 'চ' বর্গে ঞ, 'ট' বর্গে ণ, 'ত' বর্গে ন এবং 'প' বর্গে ম। এবং প্রতিটি ধ্বনিরই বিশিষ্ট উচ্চারণ পার্থক্যও ছিল।

☐ দুই ☐ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার কাল ছিল ৫টি :

লট — বর্তমান
লৃট — ভবিষ্যৎ
লঙ, লুঙ, লিট — অতীত

২। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় ক্রিয়ার ভাব (Mood) ছিল পাঁচটি :

লেট — অভিপ্রায়
লোট — অনুজ্ঞা
বিধিলিঙ্গ — নির্বন্ধ, নির্দেশক ও সম্ভাবক।

৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বচন ছিল ৩টি :

একবচন দ্বিবচন বহুবচন

৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পুরুষ ছিল ৩টি :

উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ প্রথম পুরুষ

— বচনভেদে প্রত্যেকটি পুরুষে ক্রিয়ার পার্থক্য ঘটতো।

৫। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে লিঙ্গ ছিল ৩টি :

পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ

—তখন লিঙ্গ নির্ভর করতো ব্যাকরণ নির্দিষ্ট পথে। যেমন— 'নদী' বা 'লতা' এখনকার ভাবনায় ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু প্রাচীন-ভারতীয়-আর্যে সেগুলি ছিল স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যাকরণে তাই কোন শব্দ কী লিঙ্গ হবে, তা নির্দিষ্ট হয়েছে। সেজন্য ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, প্রাচীন-ভারতীয়-আর্যে লিঙ্গ ছিল নির্দিষ্ট ব্যাকরণ সম্মত।

৬। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে কারক ছিল ৮টি :

কর্তৃ কর্ম করণ সম্প্রদান
অপাদান অধিকরণ সম্বন্ধপদ সম্বোধনপদ।

৭। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ক্রিয়া বিভক্তির রূপ ছিল ২টি :

আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ।

৮। এই ভাষায় বাচ্য ছিল—২টি : কর্তৃবাচ্য ও কর্ম-ভাববাচ্য।

৯। এই ভাষায় প্রত্যয় ছিল— ২টি : কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়।
[illegible]

১০। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে উপসর্গ ছিল — [illegible]

১১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে [illegible]

১২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বাক্যমধ্যে পদবিন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। তবে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির বিভক্তি চিহ্ন অতি সুনির্দিষ্ট ছিল বলে কোনো বাক্যের মধ্যে সেগুলি যেখানেই থাকুক না কেন, [illegible] বাক্যের অর্থ [illegible] না। যেমন : [illegible]

১৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্য—বৈদিকে একাধিক পদে সমাস হতো না, [illegible] দুই পদে সমাস হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে সংস্কৃতে সমাসের [illegible]

১৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ছন্দ ছিল অক্ষরমূলক— অর্থাৎ অক্ষর গুণে গুণে এবং অক্ষরের লঘু গুরু মেনে মাত্রা নির্ণীত হতো। এতে সুর বা তানের প্রাধান্য ছিল। শেষদিকে ছন্দ হয়েছিল মাত্রামূলক॥

(৩) দুই। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (প্রাকৃত) : সাধারণ বৈশিষ্ট্য

☐ সংজ্ঞা ও স্থিতিকাল

ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তরের নাম 'মধ্যভারতীয় আর্যভাষা'। পণ্ডিতদের মতে এর স্থিতিকাল—৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ[1]।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ভাষাগত নাম 'প্রাকৃতভাষা'। প্রাকৃত বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র বলেন— 'প্রাকৃত' এসেছে 'প্রকৃতি' থেকে। প্রকৃতি মানে মূলবস্তু অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার মূলবস্তু হলো—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত। আর তার থেকেই জন্মেছে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। তাই 'প্রকৃতি' থেকে জন্মেছে বলেই দ্বিতীয় স্তরের ভাষার নাম 'প্রাকৃত'[2]।

☐ যুগবিভাগ, স্থিতিকাল, নিদর্শন ও ভাষা-নাম

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট উপস্তর লক্ষ্য করেছেন পণ্ডিতেরা। সেগুলি হলো :

১ সুকুমার সেনের মতে স্থিতিকাল—খ্রিস্টপূর্ব [illegible] খ্রিস্টীয় [illegible] পর্যন্ত।
২ 'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্' — হেমচন্দ্র

(ক) প্রথম উপস্তর
- ☐ স্থিতিকাল = খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ— খ্রীঃ ১ম
- ☐ নিদর্শন = নানা অনুশাসন
- ☐ ভাষা-নাম = (উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ-মধ্য-প্রাচ্য) প্রাকৃত

(খ) দ্বিতীয় উপস্তর
- ☐ স্থিতিকাল = খ্রীঃ ১ম—৬ষ্ঠ
- ☐ নিদর্শন = সংস্কৃত নাটকের নারী ও ভৃত্যের সংলাপ
  = জৈন সাহিত্য
  = নানা প্রাকৃতে অপভ্রংশ অপভ্রষ্টে লেখা— কিছু মহাকাব্য—নাট্যকাব্য— গীতিকাব্য— ছন্দঃশাস্ত্র—ব্যাকরণ প্রভৃতি।
- ☐ ভাষা-নাম = মাগধীপ্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত, অর্ধমাগধী প্রাকৃত।

(গ) তৃতীয় উপস্তর
- ☐ স্থিতিকাল = খ্রীঃ ৬ষ্ঠ—৯ম
- ☐ নিদর্শন = অপভ্রংশে লেখা—মহাকাব্য, কথানক, গীতিকাব্য, সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু সংলাপ।
- ☐ ভাষানাম = মাগধী অপভ্রংশ, শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ, পৈশাচী অপভ্রংশ, অর্ধমাগধী অপভ্রংশ।

☐ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা আসলে আঞ্চলিক উপভাষার মতো। স্থানে স্থানে তার স্থানীয় নাম। অশোকের অনুশাসনগুলিতে 'উত্তর-পশ্চিমা', 'দক্ষিণ-পশ্চিমা,' প্রাচ্য-মধ্যা' ও 'প্রাচ্যা'—এই চার রকমের 'আঞ্চলিক প্রাকৃতে'র সন্ধান মেলে। 'সুতনুকা' প্রত্নলেখ তার একটি উদাহরণ। তেমনি প্রচলিত প্রাকৃতগুলির নাম 'মাগধী', 'শৌরসেনী', 'মাহারাষ্ট্রী', 'পৈশাচী' ও 'অর্ধমাগধী'। আবার এই পাঁচ নামেই অপভ্রংশ প্রচলিত। পণ্ডিতেরা এগুলির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন। আবার এগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যও বলেছেন। তাঁদের সেই নির্দেশ মেনেই আমরা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করছি :

☐ এক।। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ☐

১. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

২. ঌ, দীর্ঘ ঌ, ৠ-কার সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।

৩. ঋ-কার নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে— কখনো 'ঋ' হয়েছে 'অ', 'ই', 'উ', 'এ'— কখনো ঋ হয়েছে 'র', 'রি', 'রু', যেমন :

ঋ > অ— মৃগ > মগ। তৃণ > তণ	ঋ > এ— বৃন্ত > বেন্ট
ঋ > ই— মৃগ > মিগ। হৃদয় > হিঅঅ	ঋ > র— বৃক্ষ > রুক্ষ
ঋ > উ— মৃগ > মুগ। ঋজু > উজু	ঋ > রি— ঋষি > রিসি

৪. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ঐ-কার 'এ'-কারে এবং ঔ-কার 'ও'-কারে পরিণত হয়েছে।

যেমন :

ঐ > এ— বৈদ্য > বেজ্জ, তৈল > তেল্ল, তেল, মৌক্তিক > মোত্তিঅ।
ঔ > ও— কৌমুদী > কোমুই, ঔষধ > ওসধ, গৌরী > গোরী।

৫. যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী আ, ঈ, ঊ— ধ্বনির হ্রস্বতা।

আ > অ— কাব্য > কব্ব। কান্ত > কন্ত। কার্য > কজ্জ।
ঈ > ই— কীর্তি > কিত্তি। তীক্ষ্ণ > তিক্‌খ।
ঊ > উ— মুহূর্ত > মুমুত্ত। মূল্য > মুল্ল।

৬. যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। যেমন :

অ > আ— অশ্ব > আস, স্পর্শ > ফাস।
ই > ঈ— শিষ্য > সীস, বিশ্রাম > বীসাম।
উ > ঊ— দুর্লভ > দূলহ, দুঃসহ > দূসহ।

৭. পদান্তস্থিত অনুস্বারের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়েছে। যেমন :

পাংশু > পংসু। কান্তাং > কন্তং।

৮. পদমধ্যস্থ অনুস্বার লোপ পেলে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে যেমন :

বিংশত > বীসা। ত্রিংশত > তীসা।

৯. 'অয়' এবং 'অব' যথাক্রমে 'এ' এবং ও-কারে পরিণতি লাভ করেছে। যেমন :

অয় > এ— কথয়তু > কথেতু। পূজয়তি > পুজ্জেতি, পুজ্জেই।
অব > ও— লবণ > লোণ। ভবতি > ভোদি।

১০. তবে, পদের শেষে যুক্তব্যঞ্জন না-থাকলে অনুস্বার রক্ষিত হয়েছে। যেমন :

নরম (নরং) > নরং।

১১. পদান্তস্থিত বিসর্গ কখনো 'এ' বা 'ও' হয়েছে। কখনো লোপ পেয়েছে। যেমন:

ঃ > এ— জনঃ > জনে
ঃ > ও— জনঃ > জনো
ঃ > লোপ— জনঃ > জন, মুনিঃ > মুনি

১২. পদান্তস্থিত 'ম' বা 'ন' থেকে জাত অনুস্বার ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে। যেমন :

নরান > নরা। পুত্রাৎ > পুত্তা।

১৩. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় 'শ', 'ষ', 'স'— এই তিনটি শিসধ্বনির নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে—

(ক) মাগধী প্রাকৃতে 'শ' আছে, অন্য দুটি নেই। যেমন :
সুতনুকা > শুতনুকা (শুতনুক নম দেবদশিক্যি)।

(খ) অন্যান্য প্রাকৃত গুলিতে 'স' আছে। অন্য দুটি নেই। যেমন :
দ্বাদশ > দুবাদস। তিষ্ঠন্ত > তিস্‌ঠন্তো।

১৪. মধ্যভারতীয় আর্যে দন্ত্যবর্ণ (ত, থ, দ, ধ, ন) স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূর্ধণ্য বর্ণে (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) পরিণত হয়েছে। কখনো বা দন্ত্যবর্ণ গুলি ঋ, র, শ, ষ যোগে 'ণ' বর্ণে পরিণত হয়েছে । যেমন :

বিকৃত > বিকট। দ্বাদশ > দুবাডস।

১৫. পদের আদিস্থিত যুক্তব্যঞ্জন কখনো একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে, কখনো বিশ্লিষ্ট হয়েছে। যেমন ঃ-

ব্রাহ্মণ > বম্হন। ত্রীনি > তিন্নি।

১৬. পদের মধ্যস্থিত বা অন্ত্যস্থিত যুক্তব্যঞ্জন যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। যেমন ঃ

মধ্যস্থিত = কল্যাণম > কল্লাণং।

অন্ত্যস্থিত = ভক্ত > ভত্ত।

১৭. কখনো কখনো (দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপস্তরে) পদমধ্যস্থিত একক ব্যঞ্জন—

(ক) অল্পপ্রাণ হলে লোপ পেয়েছে। যেমন ঃ

শোক > শোঅ

(খ) মহাপ্রাণ হলে 'হ'-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন ঃ

শেফালিকা > সেহালিআ।

১৮. অনেকসময় অঘোষধ্বনি সঘোষ হয়েছে। যেমন ঃ

দীপা > দীব, শকট > সগড, ঋতু > উদু কলাপ > কলাব।

দুই ।। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ এক বোঝাতে একবচন এবং একের অধিক বোঝাতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

একবচন > বহুবচন

পুত্তো > পুত্ত। গঙ্গ > গই, গঙ্গীউ, গঙ্গীও।

২। লিঙ্গ বিধি ঃ মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দান্তস্থিত ব্যঞ্জনলোপের জন্যে প্রথমা ও দ্বিতীয় বিভক্তির বহুবচনে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ভেদ নাই। যেমন ঃ-

ফলানি > ফলা নরান্ > নরা

৩। ধাতুরূপে আত্মনেপদের লোপ। সর্বত্রই পরস্মৈপদের ব্যবহার।

৪। শব্দরূপে চতুর্থী বিভক্তির লোপ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সাদৃশ্যনীতির প্রয়োগ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সরলতা— এযুগের ভাষার প্রধান উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য।

৫। মধ্যভারতীয় আর্যে দশটি গণের মধ্যে একমাত্র ভ্বাদি গণই বর্তমান আছে (অন্য নটি গণ লোপ পেয়েছে)।

৬। এযুগের ভাষায় ক্রিয়ার কালের রূপ গুলি হলো নিম্নরূপ ঃ

বর্তমান কাল— নির্দেশক (লট্), অনুজ্ঞা (লোট), সম্ভাবক (বিধিলিঙ্)।

অতীত কাল— লিট-এর লোপ, লঙ ও লুঙের একাত্মীকরণ।

ভবিষ্যৎ কাল— লৃট—ছাড়া অন্যগুলির যোগ।

৭। এযুগের ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে। আবার নিষ্ঠান্ত (ক্ত প্রত্যয়) পদ অতীতকালের অর্থে সমাপিকা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্তির লোপ পেয়েছে বলে পদস্থাপন বা বাক্যগঠন রীতিতে কঠোরতা বা সংযম এসেছে।

৯। এযুগের ভাষায় অধিকাংশ বিভক্তি লোপ পেয়েছে। সেজন্যে বিভিন্ন শব্দকে অনুসর্গরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

১০। এযুগের ছন্দ প্রধানত মাত্রামূলক অর্থাৎ অক্ষর উচ্চারণের কাল অনুসারে এযুগে শব্দের মাত্রা নির্ণয় করা হতো। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, চরণ প্রথম দিকে বিষমমাত্রিক ছিল— শেষদিকে তা বিষম মাত্রিকের সঙ্গে সমমাত্রিক হলো। এবং সর্বশেষে চরণান্তিক মিল প্রধান লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যেমন ঃ

(ক) মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত

কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণত্থি বিঅ মামি মানুসে লোএ

অহ হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জিঅই।

[অনুবাদ ঃ হে সখি ছলনাহীন প্রেম মানুষের পৃথিবীতে হয় না। যদি তা হতো তবে কার আর বিরহ থাকতো। বিরহ হলে কেই বা বাঁচতে।]

(খ) অপভ্রংশ

সো মহু কন্তা, দূর দিগন্তা

পাউস আএ, চেলু দুলাএ।

[অনুবাদ ঃ আমার প্রিয় দূর দিগন্তে (গেছে)। বর্ষা আসে, আমার বস্ত্রাঞ্চল দুলছে।]

(৩) তিন। নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা ঃ সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(New Indo-Aryan and its Linguistic Features)

ন. ভা. আ. (NIA)

ভারতীয় আর্য-ভাষা
- প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক-সংস্কৃত) (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—৬০০ খ্রীঃ পূঃ)
- মধ্যভারতীয় আর্য (প্রাকৃত) (৬০০ খ্রীঃ পূঃ—৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)
- নব্য-ভারতীয় আর্য (৯০০খ্রীষ্টাব্দ—আজ পর্যন্ত)
  - বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, পঞ্জাবী, মরাঠী, হিন্দী, গুজরাটি, নেপালী

❑ সংজ্ঞা

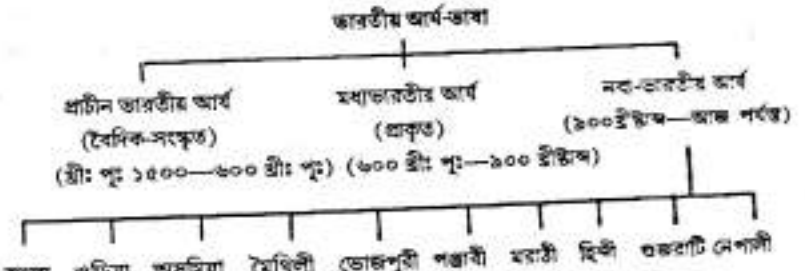

খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা থেকে জাত, যে সব আঞ্চলিক ভাষা সম্প্রদায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ভূত হয়েছিল এবং আজও নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, তাদের নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলে। যেমন ঃ বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, পঞ্জাবী, মরাঠী, হিন্দি, গুজরাটি, নেপালী, বাঘেলী প্রভৃতি।

সংজ্ঞা-বিবৃতি

সুতরাং নব্যভারতীয় আর্যভাষার

(ক) জন্ম / উৎস— মধ্যভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত বা লৌকিক ভাষা অপভ্রংশ বা অবহট্ঠ থেকে।

(খ) জন্ম / উদ্ভব কাল—(আনুমানিক) খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।

(গ) নিদর্শন ও ভৌগোলিক বর্গীকরণ—আজকে অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে, সেগুলিই হলো নব্যভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক বা স্থানীয় নাম।

প্রচলিত অঞ্চল-নাম অনুসারে পণ্ডিতেরা এগুলির নাম দিয়েছেন :

(ক) প্রাচ্যখণ্ডে প্রচলিত— বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী।

(খ) প্রাচ্য-মধ্যখণ্ডে প্রচলিত— বাঘেলী, ছত্রিশগড়ী।

(গ) উত্তর (হিমালয়) অংশে প্রচলিত— নেপালী, গাড়োয়ালী, গোর্খালী।

(ঘ) উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রচলিত— সিন্ধী, পাঞ্জাবী।

(ঙ) মধ্যদেশে প্রচলিত— হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাটি।

(চ) দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত— মরাঠী, কোঙ্কনী।

— এই যে প্রচলিত অঞ্চল বা স্থান অনুসারে ভাষাসম্প্রদায়গুলির ভৌগোলিক জরিপ, তাকেই বলে 'ভৌগোলিক বর্গীকরণ'।

□ নব্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য □

'নব্যভারতীয় আর্যভাষা'— একটি নয়, অনেকগুলি। তামাম ভারতবর্ষের এক এক অঞ্চলে সেগুলির এক এক নাম। যেমন— বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, ভোজপুরী, গুজরাটী, নেপালী প্রভৃতি। এগুলির উৎস সাধারণ বিচারে অবশ্যই মধ্যভারতীয় আর্যভাষা— প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। আর জন্ম উৎস এক বলেই, এগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগত অনেক সাধারণ মিল বা লক্ষণ বর্তমান। অঞ্চল বিশেষে দীর্ঘদিন প্রচলিত বলেই, এদের নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। আমরা সেই 'নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য' টুকু বাদ দিয়ে এদের ভাষাতত্ত্বগত সাধারণ লক্ষণগুলিই এখানে আলোচনা করছি :

এক ।। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি নব্যভারতীয় আর্যভাষায় লোপ পেয়েছে অথবা বিকৃত হয়েছে। যেমন :

সং মিহির > ন. ভা. আ. (বাংলা) মিহির্। রাম > রাম্।

সং জল্ > জল্। গৌরব > গৌরব্। প্রদীপ > প্রদীপ্।

২. পদমধ্যস্থ দ্বিস্বরধ্বনির (ইঅ, ঈআ, উঅ, ঊআ) শেষটি 'অ' অথবা 'আ' হলে— তা লুপ্ত হয়েছে। যেমন :

মৃত্তিকা > মট্টিআ > মাটি।

৩. কখনো কখনো পদমধ্যস্থিত 'ইঅ' বা 'উঅ' যথাক্রমে 'ঈ' বা 'ঊ' হয়েছে। যেমন : ঘৃত > ঘিঅ > ঘী।

৪. পদমধ্যস্থ যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর ক্ষতিপূরণ বাবদ দীর্ঘস্বর হয়েছে। যেমন :

কার্য > কজ্জ > কাজ। ধর্ম > ধম্ম > ধাম। নৃত্য > নচ্চ > নাচ।

হস্ত > হত্থ > হাত। তঙ্ক > টঙ্কা > টাকা। পক্ব > পক্ক > পাক।

৫. যুক্তব্যঞ্জনের প্রথমটি নাসিক্য ধ্বনি হলে (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম), সেটি ক্ষীণ হয়ে লোপ পায় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে। যেমন :

সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ। অঞ্চল > অঞ্চল > আঁচল।

সন্তার > সংতার > সাঁতার। নিম্বু > নিংবু > নেবু।

কণ্টক > কণ্টঅ > কাঁট (কাঁটা)। চণ্ডাল > চণ্ডাল > চাঁড়াল।

৬. দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন থাকলে, তার সংশ্লিষ্ট স্বরটির নানা পরিণতি ঘটে :

(ক) কখনো উদ্বৃত্ত স্বরটি লোপ পায়—

ঘৃত (ঘ্ + ঋ + ত্ + অ (উদ্বৃত্তস্বর) > ঘিঅ > ঘী।

(খ) কখনো পার্শ্ববর্তী স্বরের সঙ্গে উদ্বৃত্ত স্বরটির সন্ধি হয়—

গত + ইল্ল > গেল [গত > গঅ, গঅ। গঅ + ইল (< ইল্ল)]

(গ) কখনো উদ্বৃত্ত স্বরটি পার্শ্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বিস্বর হয়—

অ + উ = ঔ— বধূ > বউ > বৌ (ব্ + অ + ধ + উ > ব্ + অ + উ)

— মধু > মউ > মৌ।

৭. নব্যভারতীয় আর্যে বহু বিদেশী ভাষার শব্দ ঢুকেছে। সেই সব বিদেশী শব্দের প্রভাবে নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন :

ক — কলেজ জ — জর্জ

খ গ ফ

।। দুই ।। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। **লিঙ্গ :** নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীনভারতীয় আর্যের লিঙ্গবিধি যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় নি। (১) মরাঠী ও গুজরাটি ভিন্ন অন্য সব ভাষায় ক্লীবলিঙ্গ লোপ পেয়েছে। (২) সিংহলীতে 'সপ্রাণ' ও 'অপ্রাণ' নামের নতুন দুটি লিঙ্গ সৃষ্ট হয়েছে। (৩) অনেকগুলি নব্যভারতীয় আর্যে শব্দের অর্থ অনুসারে লিঙ্গ নির্ণীত হয়েছে। (এবং সংস্কৃতের নিয়ম মানা হয় নি) যেমন :— সংস্কৃতে 'লতা' বা 'নদী' স্ত্রী লিঙ্গ; নব্যভারতীয় আর্যের বাংলায় 'লতা' বা 'নদী' ক্লীবলিঙ্গ। (৪) বাংলায় সর্বনামে লিঙ্গ ভেদ উঠে গেছে। যেমন :— নারী বা পুরুষ— উভয়েই বলে— 'আমি' ব্যাকরণ পড়ি। নারী বা পুরুষ— উভয়দলকে দেখিয়েই বলি—'তোরা যা'।

২। **বচন :** নব্যভারতীয় আর্যে বচন দু রকম— একবচন, বহুবচন। কিন্তু সংস্কৃতের মতো এখানে দু রকম বচনের রূপভেদ নেই। এখন বহুবচন হলো— (ক) বহুত্ববাচক পৃথক শব্দ (সব, সকল, দল, সমস্ত, গুলি) দিয়ে গঠিত অথবা

(খ) ষষ্ঠী বিভক্তির ক্ষয়িত রূপ (রা, এরা, এদের) দিয়ে গঠিত। যেমন—

একবচন > বহুবচন

লোক লোকগুলি, সমস্ত লোক, লোকেরা, লোকদের।

তবে হিন্দি মরাঠী সিন্ধীতে একবচন ও বহুবচনের পৃথকরূপও আছে—

হিন্দি = লড়কা—লড়কে।

৩। **কারক :** নব্যভারতীয় আর্যে কারক প্রধানত দুটি—

মুখ্য কারক — কর্তা

তির্যক/গৌণ কারক — করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ (কর্মকারক আগেই কর্তা কারকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।)

৪। **বিভক্তি :** নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীন বিভক্তি গুলির অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। (মাত্র দু একটি প্রাচীন বিভক্তির পরিবর্তিত রূপ বর্তমান আছে)। আর লোপপাওয়ার ক্ষেত্রে বিভক্তির অর্থ প্রকাশের জন্য নতুন নতুন প্রত্যয়, প্রত্যয়গত শব্দ ও অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

বাংলায়— র, এর, আগে, কে। বাংলার লোক; ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার; তোমার আগে কহিল নিশ্চয়; জলকে চল্।

হিন্দিতে— সে (< সম), কো(কৃত)— ঘর সে (ঘর থেকে), রামকো (রামকে)।

৫। **ক্রিয়ার কাল ও ভাব :** নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মতো ক্রিয়ার পাঁচভাব ও পাঁচকাল নেই।

এখানে (ক) বর্তমান কাল নির্মিত হয়েছে কর্তৃবাচ্যে ও কর্মভাববাচ্যে।

(খ) অতীত কালের ক্রিয়াপদ সর্বত্রই ধ্বনিপরিবর্তন সাপেক্ষে 'ক্ত' প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত।

(গ) ভবিষ্যৎ কালের পদ নিষ্পন্ন হয়েছে 'তব্য' অথবা 'শত্' প্রত্যয় যোগে। তবে পশ্চিম পঞ্জাবী ও গুজরাটিতে ভবিষ্যৎ-কালের প্রাচীন রূপ বর্তমান আছে।

৬। **যৌগিক কাল :** নব্যভারতীয় আর্যে মধ্যস্তর থেকে একাধিক ধাতু মিশে যৌগিক কালের রূপ গঠিত হয়েছে। যেমন :

গত + √ভূ (√অস্) > গয়া হৈ (হিন্দী)।

গত + √অস্ (< আছে) > গিয়াছে (বাংলা)।

৭। **শ্রুতিধ্বনি :** নব্যভারতীয় আর্যে য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতির প্রচলন ঘটেছে। যেমন :

য়-শ্রুতি— দু-এক = দুয়েক, বাবুআনি = বাবুয়ানি।

ব-শ্রুতি— মো আ = মোয়া, (মোওয়া), শো আ > (শোওয়া)।

এর ফলে উচ্চারণ সৌকর্য বেড়েছে।

৮। **বিদেশী শব্দ গ্রহণ :** নব্যভারতীয় আর্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিদেশী শব্দ গ্রহণ।— আরবী, ফারসী, তুর্কী, পর্তুগীজ তো ছিলই, তার সঙ্গে মিশলো প্রচুর ইংরেজী শব্দ। এইভাবেই নব্যভারতীয় আর্যের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হলো।

৯। **বাক্যগঠন :** নব্যভারতীয় আর্যে বাক্যগঠনের বিচিত্র পদ্ধতি লক্ষ্য করা গেল। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কর্মবাচ্যের ব্যবহার বেশী রইলো না। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পদ অনুসারে পৃথক পৃথক বিভক্তি চিহ্ন বসতো। নব্যভারতীয় আর্যে বিভক্তি বিধি অনেক শিথিল হলো। অনেক সময় বিভক্তি বসলো না। ফলে কোনো বাক্যের কর্তা কর্ম নির্ণয়ে এখন জটিলতা সৃষ্টি হলো। শুধু বিভক্তি দিয়ে কর্তা কর্ম চেনা গেলো না।

১০। **ছন্দ বৈচিত্র্য :** নব্যভারতীয় আর্যে ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়ে উঠলো। অন্ত্যানুপ্রাস এলো। পর্বে পর্বে, পদে পদে মিল এলো। ছন্দে মাত্রাবৃত্ত রীতি জাঁকিয়ে বসলো। 'গদ্য-ছন্দ' এলো। তা এসে অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দকে স্তব্ধ করে দিলো। বাংলায় স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত—তিন রীতির ছন্দ। অমিত্রাক্ষর, গদ্যকবিতার ছন্দ, সনেট প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ দেখাগেলো।

□ নব্যভারতীয় আর্যভাষার নমুনা □

(১) বাংলা : (ক) ১০ম-১২শ শতকের বাংলা :

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥— চর্যাপদ

(খ) ১৫শ শতকের বাংলা :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

(গ) ১৮শ শতকের বাংলা :

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥ —(অন্নদামঙ্গল) ভারতচন্দ্র

(ঘ) ২০শ শতকের বাংলা :

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে,
সেদিন আমার বুকেরও এরকম আতরের গন্ধ হবে। — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

(২) ওড়িয়া :

রাতির দুইপহর অন্ধার থিলা। চিতোরের সবু লোক গাঢ় নিদরে শুইথিলে। রাজপুরী নির্জন থিলা। এহি সময়রে মীরা নগরকু বিদায় নেলা। কেহি তাকু বাধা দেলে নাহিঁ। রাস্তারে পৌঁছিবা নাহিঁ পড়িলা। মীরা দেখিবে ডেঁই পড়লা।

(৩) মৈথিলী :

পত্র পড়ল। পঢ়িতে কাল আঁখি সঁ নীরক ধার বহিল। পত্রক অন্ত হোইত মুর্চ্ছিত ভেল। চারু কাত ঘুরি কয় দেখল কেও অছি ত নে। সংযোগবশ কেও ছল নহি।

(৪) মগহী :

আধা রাতকে কুচকুচ অন্ধেরিয়া হল। চিতৌড় কে জেতনা লোগ হলন সব নিন্দ মে বেহোস হলন। রাজপুরী মে সানাটা হল। অইসন বখত মীরা উ সহর সে বওআনা হো গেল। কেই ওকরা রোকলোক নহী।

(৫) ভোজপুরী :

নউআ ওঁহ্ খেতে মে গোঁহু বোআলেস। উ গোঁহু জব পকে সুরু ভইল তব উহে চোর কাটে বদে এলন। তব উ বীচ খেতে মে খাটিয়া লো জাকে সুতল ॥

২ | বাংলা ভাষার স্তরবিভাগ। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

□ ভূমিকা : বাংলা ভাষার ইতিহাস

১। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

২। বাংলা ভাষার উৎস বা উৎপত্তিস্থল হলো 'মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ', কারো কারো মতে 'আদর্শ কথ্য প্রাকৃত'। (এবং 'সংস্কৃত থেকে নয়)

৩। বাংলা ভাষার এখন বয়স প্রায় এক হাজার বছর— ৯০০ খ্রীঃ থেকে আজ পর্যন্ত। এই একহাজার বছরে বাংলাভাষা নানাবিবর্তনের মধ্যদিয়ে নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

৪। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বাংলাভাষার এই হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাসকে প্রধান তিনটি স্তরে বা যুগে বিভক্ত করেছেন। যেগুলি হলো :

এক॥ 'প্রাচীন' বা 'আদি' বাংলা, কালসীমা ৯০০-১৩৫০ খ্রীঃ।

দুই॥ মধ্য বাংলা— তার দুইভাগ

(ক) 'আদি-মধ্য'বাংলা, ১৩৫১-১৫০০ খ্রীঃ,

(খ) 'অন্ত্যমধ্য' বাংলা, ১৫০১-১৭৬০ খ্রীঃ।

তিন॥ আধুনিক বাংলা, কালসীমা ১৭৬১ খ্রীঃ থেকে আজ পর্যন্ত।

□ এক □ 'প্রাচীন বাংলা' (= আদি স্তর) ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্ট লক্ষণ। (Linguistic Features of old Bengali Language)

চর্যাপদের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) কালসীমা :

প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমা হলো আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। কেউ কেউ ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কেও এই প্রাচীন বাংলার সর্বশেষ সীমা বলে মনে করেন।

(২) প্রাচীন বাংলার নিদর্শন : 'চর্যাপদ'

প্রাচীন বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন বৌদ্ধসহজ সাধকদের লেখা 'চর্যাগীতি পদাবলী' বা 'চর্যাপদ'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে এটি আবিষ্কার করেন। নাম দেন— 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। তাঁর সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' গ্রন্থে তিনি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' প্রকাশ করেন। এগুলি যে বাংলা ভাষায় লেখা, তা প্রমাণ করেন ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

[এছাড়া আরো কিছু গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা শব্দের বা ২ একটি বাংলা ছড়ার নিদর্শন আছে। এগুলি হলো—
(ক) বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের— 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন'
(খ) বন্দ্যঘটী সর্বানন্দের অমরকোষের 'টীকাসর্বস্ব'
(গ) 'সেকশুভোদয়া']

(৩) প্রাচীন বাংলাভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(এক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীন বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পূর্বস্তরের যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক-ব্যঞ্জনে পরিণতি এবং সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী হ্রস্ব-স্বরের দীর্ঘীকরণ।
সংস্কৃতে যা ছিলো যুক্তব্যঞ্জন ('কার্য'), প্রাকৃতে তা-ই হলো যুগ্ম ব্যঞ্জন (কজ্জ), বাংলা ভাষার আদিস্তর চর্যাপদে তা-ই হয়েছে একক ব্যঞ্জন (কাজ)— আর ক্ষতিপূরণ বা পরিপূরক হিসেবে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরটি দীর্ঘস্বর হয়েছে। তাই কজ্জ > 'কজ্জ' না হয়ে হয়েছে কাজ। তেমনি : জন্ম > জম্ম > জাম।
অবশ্য এর অনেক ব্যতিক্রমও আছে।

২. প্রাচীন বাংলা চর্যাপদে পদের অন্তঃস্থিত স্বরধ্বনি বর্তমান ছিল। যেমন :
ভণতি > ভণই। পুস্তিকা > পোত্থিআ > পোথী। উত্থিত > উট্‌ঠিঅ > উঠি।

৩. প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি আছে, কিন্তু দুটি মিলেমিশে (সন্ধি করে) একটি স্বরে পরিণত হয়নি। যেমন :
উদাস > উআস। এখানে উ, আ দুটি স্বরধ্বনি সন্ধিবদ্ধ হয়নি, পৃথক পৃথক আছে।

৪. প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মাঝে শ্রুতিধ্বনি হিসাবে 'য়', 'ব' ধ্বনি এসে গেছে। যেমন :
'য়' আগম = নিকটে > নিঅড়ি > নিয়ড়ি।
'ব' আগম = ত্রিভুবন > তিহুঅণ > তিহুবণ। কবড়ি। আবই।

৫. প্রাচীন বাংলায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণধ্বনি সাধারণত 'হ্‌'-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন :
মহাসুখ > মহাসুহ। কথন > কহন।

৬. প্রাচীন বাংলা ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপের প্রচুর উদাহরণ আছে। যেমন :
সকল > সঅল। সরোবর > সরোঅর।

৭. প্রাচীন বাংলায় নাসিক্য-ব্যঞ্জন ধ্বনি কখনো কখনো লোপ পেয়েছে। এবং অবলুপ্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়েছে। যেমন :
মধ্যেন > মাঝেঁ। শব্দেন > সাঁদে

৮. প্রাচীন বাংলায় উচ্চারণে বা ব্যবহারে 'ন' এবং 'ণ' এর মধ্যে পার্থক্য ছিল না। তাই একই শব্দের বানানে কোথাও 'ন' কোথাও 'ণ'। যেমন :
নাবী — ণাবী। নিয় — ণিব।

৯. প্রাচীন বাংলা ভাষায় শ, ষ, স— এই তিন শিস্ ধ্বনির উচ্চারণে বা ব্যবহারে পার্থক্য ছিল না। তাই একই শব্দের বানানে কোথাও 'শ', কোথাও 'স'; আবার কোথাও কোথাও 'স' 'ষ' হয়েছে। যেমন :
শূন — সূণ। শবরী — সবরী। মুষা — মুসা। সহজে — সহজে।

১০. প্রাচীন বাংলায় 'য' ধ্বনি উচ্চারণে বা ব্যবহারে 'জ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল। তাই চর্যাপদের বানানে কোথাও 'য' নেই। যেমন :
জে জে আইলা। জো মনগোঅর। জেন। জসু।

১১. প্রাচীন বাংলায় আদি স্বরে শ্বাসাঘাত পড়েছে। আর তারই ফলে শব্দের আদি স্বরটি অনেকসময় দীর্ঘস্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন :

'আলো ডোম্বী'। আকট (অকট)।

(দুই) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বগত একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, নাম পদে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'র' বা 'এর' ব্যবহার। এই বৈশিষ্ট্যটি একমাত্র বাংলা ভাষাতেই মেলে। যেমন :

রুখের তেন্তলি। হরিণার খুর ন দীসঅ। চেম্বন পাএর গীত।

২। প্রাচীন বাংলা ভাষায় কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি হয়— এখনকার বাংলার মতোই। যেমন:

বলদ বিআএল। পইঠো কাল। চলিল কাহ্ন। লুই ভণই। হরিণা পিবই ন পাণী।

৩। প্রাচীন বাংলায় কর্মকারকে ও সম্প্রদানে 'রে' বিভক্তি বর্তমান। এটিও শুধু বাংলাতেই পাওয়া যায়। যেমন :

তোহোরে অন্তরে। করিণা করিনিরেঁ রিসঅ।

৪। প্রাচীন বাংলায় করণকারকে 'তেঁ, 'তেঁ' বিভক্তি বর্তমান। এটিও বাংলা ভাষার একটি নিজস্ব লক্ষণ। যেমন :

সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই।

৫। প্রাচীন বাংলায় অধিকরণ কারকে 'ত' বিভক্তির প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এটিও বাংলার নিজস্ব বিভক্তি। এছাড়া অধিকরণে 'ই', 'এ', 'হিঁ', 'তেঁ' প্রভৃতি বিভক্তিও আছে। যেমন :

সাস্কমত চড়িলে। টালত ঘর মোর। মাঙ্গত চড়হিলে।

হাঁড়িত ভাত নাহি। চঞ্চল চীএ। হিঅহি ন পইসই। আমে কাম। কামে আম।

৬। প্রাচীন বাংলা চর্যাপদের ভাষায় সম্বন্ধে 'র', 'এর', 'ক' বিভক্তি হয়েছে। এটিও বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন :

মোহোর বিগোআ। রুখের তেন্তলি। এড়িএউ ছান্দক বান্ধ।

৭। প্রাচীন বাংলায় সমাপিকা ও অসমাপিকা এই দুই ক্রিয়াই ছিল। সমাপিকা ক্রিয়ায় অতীতকাল বোঝাতে 'ইল' এবং ভবিষ্যত কাল বোঝাতে 'ইব' প্রত্যয় যুক্ত হতো। যেমন :

ইল— দেখিল, আইল, রুন্ধেলা, গেলা, ভইলা।

ইব— হোইব, জাইবেঁ, করিব।

৮। প্রাচীন বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ারও প্রচুর উদাহরণ মিলে। 'ইলে' বা 'অন্তে' প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন :

ইলে— সাঙ্কমত চড়িলে। রাতি ভইলে।

অন্তে— জাগন্তে সুখাড়ী।

এছাড়াও নানা অসমাপিকার উদাহরণ হলো :

দিঢ়া চঙ্কালী। কণ্ঠে লইআ। কাঁহি গই। দিঢ় করিঅ। আঁখি বুজিঅ। অপণে বহিআ।

৯। প্রাচীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের বহুবচন পদগুলি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

সং অস্মাভিঃ > প্রা. অম্‌হাহি > অপ. অম্‌হহি > প্রা. বাং অমহে, আমহে।

এই বহুবচন পদটি একবচন 'আমি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।

তেমনি— তুষ্মাভিঃ (যুস্মাভিঃ) > তুমহাহি > তুমহহি > তুমহে।

১০। প্রাচীন বাংলায় যৌগিক-ক্রিয়ার ব্যবহার খুব উল্লেখযোগ্য। যেমন :

গুণিয়া লেহঁ। দুহিল দুধু। দিঢ় করিঅ। উঠি গেল।

১১। প্রাচীন বাংলা ভাষায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে কর্ম বা ভাববাচ্যের বহুল ব্যবহার আছে। যেমন :

রাতি পোহাইলী। খুর ন দীসঅ। বাট জাইউ।

১২। প্রাচীন বাংলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শব্দদ্বিত্ব। যেমন :

উঁচা উঁচা পাবত। কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই। জে জে আইলা তে তে গেলা।

১৩। প্রাচীন বাংলা ভাষায় যেমন সংখ্যা -বাচক বিশেষণ ছিল, তেমনি বহুত্ব-বোধক বিশেষণও ছিল। যেমন :

সংখ্যাবাচক = পঞ্চবি ডাল। বতিস জোইনী। তিশরণ নাবী। চৌষঠ্‌ঠী কোঠা।

বহুত্ববোধক = সকল সমাহিঅ। জোইনী জাল।

১৪। প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে অনেক গুলি প্রবাদ প্রবচন আছে। যেগুলিকে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য বলে বিবেচনা করা হয়। যেমন :

(ক) অপনা মাঁসেঁ হরিণা বৈরি।	(ঘ) দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামায়।
(খ) হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।	(ঙ) জো সো চৌর সোই সাধী।
(গ) জো সো বুধী সোধ নিবুধী।	(চ) বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।

(৪) নিজস্ব মন্তব্য :—

বাংলা ভাষার আদি যুগের প্রধানতম নিদর্শন 'চর্যাগীতি' বা 'চর্যাপদ'। আর এই গ্রন্থেই বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি এমন ভাবে গড়ে উঠেছে, যা মধ্য-স্তরের মধ্যদিয়ে আধুনিক স্তরেও আমরা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করি। ডঃ সুনীতিকুমারের পর ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ডঃ রামেশ্বর শ প্রমুখ ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা এই ভাষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এবং তাঁদের ধারাপথে আমরা সহজে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলিকে অনুধাবন করেছি। বলাবাহুল্য, চর্যাপদেই বাংলা ভাষার ভিত্তিপ্রস্তর সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত হয়েছে॥

□ দুই □ মধ্যবাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য/বিশিষ্ট লক্ষণ

মধ্যবাংলা
(১৩৫১-১৭৬০)

আদি-মধ্যবাংলা
(১৩৫১-১৫০০)
১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

অন্ত্য-মধ্যবাংলা
(১৫০১-১৭৬০)
১. বৈষ্ণব পদাবলী
২. বৈষ্ণব জীবনী (চৈতন্য জীবনী)
৩. মঙ্গল কাব্য
৪. অনুবাদ কাব্য
৫. মুসলমানী সাহিত্য
৬. শাক্তপদাবলী

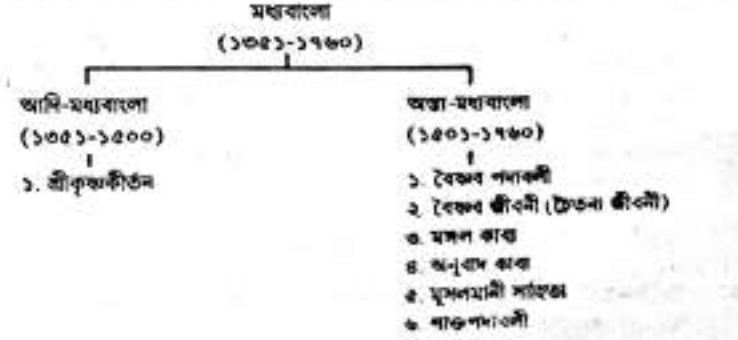

□ ভূমিকা :

পণ্ডিতদের মতে, বাংলা ভাষার জন্ম ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। তারপর আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে, নানাভাবে বাংলা ভাষা বিবর্তিত হচ্ছে। এই সুদীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাসকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা তিনটি প্রধান যুগে বা স্তরে বিভক্ত করেছেন :

ক. 'আদিস্তর' বা 'প্রাচীন বাংলা'। নিদর্শন 'চর্যাপদ'। স্থিতি কাল ৯০০-১৩৫০ খ্রীঃ।

খ. 'মধ্যস্তর' বা 'মধ্যবাংলা'। স্থিতিকাল ১৩৫১-১৭৬০ খ্রীঃ।

গ. 'আধুনিক স্তর' বা 'আধুনিক বাংলা'। স্থিতিকাল ১৭৬১ খ্রীঃ থেকে আজ পর্যন্ত।

তন্মধ্যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়—'মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ'। পণ্ডিতদের মতে, মধ্যবাংলার কালসীমা ১৩৫১ খ্রীঃ থেকে ১৭৬০ খ্রীঃ। অর্থাৎ প্রায় চারশো বছর। যেহেতু ভাষা পরিবর্তনশীল এবং নদীর মতো খাত পরিবর্তনকারী, তাই সূক্ষ্ম বিচারে এই মধ্যবাংলার দুটি উপবিভাগ বা উপস্তর আছে :

(ক) 'আদিমধ্য' (স্থিতিকাল = ১৩৫১-১৫০০ খ্রীঃ)।

(খ) 'অন্ত্যমধ্য' (স্থিতিকাল = ১৫০১-১৭৬০ খ্রীঃ)।

॥ দুই (অ) ॥ 'আদি-মধ্য' বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ

(Linguistic Features of Early-Middle Bengali Language)
(শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বৈশিষ্ট্য)

(১) কালসীমা :—

'আদি-মধ্য'স্তরের বাংলা ভাষার কালসীমা আনুমানিক ১৩৫১ খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ।

(২) নিদর্শন :— (প্রামাণিক)

আদি-মধ্য যুগের (উপস্তর) বাংলা ভাষার একটি মাত্র প্রামাণিক নিদর্শন মিলেছে : বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। বসন্তরঞ্জন রায় তা ১৩১৬ বঙ্গাব্দে আবিষ্কার করেন। এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তা প্রকাশ করেন।

অন্য নিদর্শন (কল্পিত)

কেউ কেউ মনে করেন নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিও এই আদি-মধ্য উপস্তরের রচনা। এগুলি হলো— (ক) মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', (খ) কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালী', (গ) বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়', (ঘ) নারায়ণদেবের 'মনসামঙ্গল', (ঙ) বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'।

কিন্তু এগুলির ভাষা বার বার এত পরিবর্তিত হয়েছে যে, এগুলিতে 'আদি-মধ্য'যুগের বাংলা ভাষার স্থিটেফোঁটা নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয় নি। তাই পণ্ডিতেরা এগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষার উপর নির্ভর করেই 'আদি-মধ্য' বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন। কারণ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে মূলে হস্তক্ষেপ বেশি হয়নি এবং একমাত্র এটিই সেকালের ভাষা সুরক্ষিত হয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ সুকুমার সেন এ-বিষয়ের প্রথম প্রবক্তা। পরবর্তীকালে তাঁদের পথই ভাষাতাত্ত্বিকেরা অনুসরণ করেছেন। আমরাও সেই নির্দেশিত পথেই 'আদি-মধ্য' বাংলা স্তরের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছি :

এক ॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। আদি-মধ্য বাংলাভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য— আ-কারের পরে ই-কার বা উ-কার থাকলে, তা ক্ষীণ হয়। যেমন :

আউলাইল। আইহন। গাইল। মাইলোঁ। বড়ায়ি।

(এখানে ক্ষীণ হয়েছে— উ, ই, ই, ই। বড়ায়ির উচ্চারণ হয়েছে = বড়াই)।

২। আদি-মধ্য বাংলায় আ-কারের পরে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে, সে-দুটি মিলিয়ে যৌগিক-স্বরের সৃষ্টি হয়। যেমন :

আ এ (বাএ, রাএ)। আই (গাইল, নাইল)। আও (জাওঁ, লুকাওঁ)।

৩। আদি-মধ্য বাংলার আর একটি বৈশিষ্ট্য—নাসিক্য ব্যঞ্জন (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) যোগে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ। যেমন :

কাম্তি > কাঁতি। ঝম্প > ঝাঁপ।

(তবে এর ব্যতিক্রমও প্রচুর— কাণ্ড/কুম্ভার/আম্হি।)

৪। আদি-মধ্য যুগে বাংলা ভাষার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য—মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণ লোপ অথবা ক্ষীণতা। যেমন :

কাহ্ন > কানু। বুঢ় > বুড়। আহ্মি > আমি।

৫। আদি-মধ্য বাংলার একটি অন্যতর বিশিষ্ট লক্ষণ— অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে 'হ্' ধ্বনি থাকলে ঐ অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণে পরিণত হয়। যেমন :

একহোঁ > এথোঁ। কবহোঁ > কভোঁ। কতহো > কথো।

৬। আদি-মধ্য যুগের বাংলা ভাষায়— ই-কার অনেকসময় উ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন :

দ্বিগুণ > দুগুণ। দ্বিচারিণী > দুচারিণী।

৭। এই যুগের বাংলায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থেই) প্রথম শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার ফলে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। যেমন :

আহর (অপর)। আতিশয় (অতিশয়)। আন্ধারী (অন্ধকার)। আথান্তর (অবস্থানন্তর)। আমান (অমান্য)। আইহন (অভিমন্যু)। আভিসার/ আনল/ আসুখ/ আঝর/ আধিক/ আমৃত/ আভাগী।

৮। এই যুগের ভাষায়, যত্রতত্র আনুনাসিক ধ্বনির প্রচুর প্রয়োগে ঘটেছে। যেমন :

শবদেঁ / হআঁ / মোঁ / কৈলোঁ / হারায়িলোঁ / করিতেঁ।

নহোঁ / জাওঁ / পসিআঁ / লুকাওঁ / আউলাইলোঁ।

বংশীখণ্ডের 'কে না বাঁশি' পদে এই ১১টি আনুনাসিক শব্দ আছে।

৯। এই যুগের গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বানানে নিম্নলিখিত ধ্বনিগুলির পার্থক্য রক্ষিত হয় নি :

(১) ই, ঈ = আঁখি / আঁখী। দুতি / দূতী। সিতল / সিশেব। সিতা।

(২) উ, ঊ = উজল / ঊজল। তীন। চুরী। অনুমতী। ছাড়ী। হাথীবাক। জাউ/ জাঊ।

(৩) ণ, ন = মণ / মন। পুণী / পুনী। কেমণে / কেমনে। পাণী / পানী। শাল / নাল।

(৪) শ, ষ, স = শীতার / শলিল, হেষ / সসা। সশুর/ শীতল / সিশের।

(৫) য, জ = জাএ / যাএ। জাওঁ / যাওঁ। জাই / যাই। জাইবে / যাইবেঁ। জান / যান। যত / জত।

(৬) য, অ = খঅ (ক্ষয়)।

সুতরাং মনেকরি সেকালের উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রভেদ ছিল না। তাই বানানে এদের নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে।

১০। আদি-মধ্য যুগের ভাষায়, শব্দের আদিস্থিত উ-কার ও-কারে (উ > ও) এবং ও-কার উ-কারে (ও > উ) পরিণত হয়েছে। যেমন :

উ > ও = গুপতে > গোপত। বুলে > বোলে। তুলি > তোলী।

ও > উ = গোআলী > গুয়ালি,

১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ধ্বনিপরিবর্তনের কয়েকটি সুপরিচিত রূপ পাওয়া যাছে। যেমন :

(ক) স্বরভক্তি / বিপ্রকর্ষ : বারিষা (বর্ষা)। বেআকুল (ব্যাকুল)। গেআন (জ্ঞান)। তরাসে (ত্রাসে)। মুগধী (মুগ্ধ-স্ত্রীলিঙ্গে)। পুরুবে (পূর্বে)। আরতি (আর্তি)। শকতি (শক্তি)।

(খ) স্বরসঙ্গতি : রহিলী (রহিল)। অনুপামা (অনুপম)। তোহ্মারা (তোহ্মার)। বিকলি (বিকল)।

(গ) ধ্বনি লোপ : যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জন লোপ—দুলভ (দুর্লভ)। সামী (স্বামী)। তন (স্তন)। আখর (অক্ষর)।

(ঘ) ধ্বন্যাগম : নতুন ধ্বনির সংযোগে অযুক্তবর্ণ যুক্তবর্ণে রূপ পেয়েছে—ছিণ্ডিআঁ (আগম = ণ); আহ্মারে (আগম = হ); পান্থি (আগম = হ)।

(ঙ) মিশ্রণ : খরল = খর + গরল, গহীণ = গহন + গভীর।

দুই ॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আদি-মধ্যযুগের বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের) ভাষার একটি প্রধান রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো— কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি— (এটি চর্যাতেও ছিল— আজও আছে)। যেমন :

কাক কাড়ে রাএ। তেলি আগে জাএ। আন্তর পোড়এ এবেঁ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর। চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে।

২. এই যুগের ভাষায় গৌণকর্ম ও সম্প্রদানকারকে 'ক', 'কেঁ', 'রে' বিভক্তি মিলে। যেমন :

ক = হান পাঁচবাণ তাক না করিহ দয়া।

কে = কংসেকে বুলিল কন্যা; কাহ্নাঞিকে বোল সে আপনে।

রে = সাপেরে করিআঁ বিষদানে।

৩. এই যুগের ভাষায় করণ কারকে 'ত', 'এ', 'এঁ', বিভক্তি বর্তমান। যেমন :

ত= হাথত ধরিআঁ মোর দগধপরাণে।

এ = মিছাই মাথাএ পাড়এ সান।

এঁ = নিজ মাসেঁ হরিণী জগতের বৈরী।

৪. আদি-মধ্যযুগের ভাষায় সম্বন্ধ পদের ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'র', 'এর', 'ক', 'কের'। যেমন:

র = ভাগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারি।

এর = উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারি।

ক = আনাথী নারীক কত থাকে অভিমান।

কের = তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে।

৫। আদিমধ্য যুগের গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপাদানকারকে 'ত', 'তে', 'তেঁ' বিভক্তি লক্ষণীয়। যেমন :

ত = আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মনে;

মাত বাপত বড় গুরুজন নাহী।

তে = জলতে উঠিলী রাহী।

৬। এযুগের ভাষায় অধিকরণে 'এ', 'ত', 'তে', 'ত' ইত্যাদি সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন মিলেছে। যেমন :

এ = পথে মাহাদানী ধুইলা; বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞির দান বটে।

ত = সেজাত সুতিআঁ; বাটত সুজিআঁ দান।

তে = সিসতে সিন্দূর।

৭। এ যুগের ভাষায় কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কিছু কারকেও বিভক্তিহীনতার সন্ধান মেলে। যেমন :

কর্ম— ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে। চতুর্দিশ চাহী কৃষ্ণ দেখিতে না পাইল।

অধিকরণ— তবেঁ তৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।

করণ— বাড়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।

৮। আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষাতে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচন সৃষ্টি হয়েছে 'রা' বিভক্তি যোগে। যেমন :-

তোহ্মারা, আহ্মারা, তারা। পুছিল তোহ্মারা কেহে তরসিলা মনে।

আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী।

৯। এ যুগের ভাষায় তির্যক কারকের অর্থে নানান অনুসর্গের ব্যবহার ঘটেছে। যেমন :

আন্তর— তোহ্মার আন্তরেঁ গেলোঁ রাধিকার থানে।

মাঝেঁ— বনমাঝেঁ পাইল তরাসে।

সমে— তবেঁ হৈবে তার সমে মোর দরশনে।

পানে— মোর পানে চাহে যত লোক জাএ হাটে।

ঠাঁই— কেহে হেন মিছা কথা কহ মোর ঠাঁই।

কারণ— কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।

১০। এ যুগের গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বচন নিষ্পন্ন হয়েছে দুই ভাবে :

(ক) প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে 'গণ', 'সব', 'জন', 'রা', 'এরা' যোগ করে— যেমন— দেবগণ, গোপীজন, সব সখি, আহ্মারা/তোহ্মারা/তারা।

(খ) অপ্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে শুধু 'গণ' যোগ করে— যেমন— প্রণামগণ, বাণগণ, আভরণগণ।

১১। আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ধাতুর সঙ্গে 'ই', 'ইআঁ', 'ইতেঁ', 'ইলে', 'ক' যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়েছে। যেমন :

ই— উড়ি পড়ি জাওঁ।

ইআঁ— পশিআঁ লুকাওঁ।

ইতেঁ— তুলিতেঁ পানি।

ইলে— বুইলে মধুর বানী।

ক— করিবাক পারে।

১২। এ যুগের ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে। যেমন :—

রহিলছে > রহিল + আছে; লইছে > লই + আছে। বুলিলছে, আনিছিল।

এছাড়াও আমরা আরও তিনটি যৌগিক ক্রিয়ার উল্লেখ করছি—

চলি গেলি রাধিকা হরিষে। চাহিলেহ কাহ্নাঞি বাঁশি। রাধা চলি জাএল।

১৩। এ যুগের ভাষায় উত্তম পুরুষে অতীত কালে 'লোঁ', 'ইল'; বর্তমান কালে 'ওঁ', 'ই' এবং ভবিষ্যত কালে 'ইব' যোগ হয়েছে। যেমন :

অতীত— চিন্তিলোঁ। আনিলোঁ। ছাড়িলোঁ মো মাহাদান। আরতিল— আরতিল কাক। আথাযিল। পাকিল।

বর্তমান— তুলী লৈলোঁ। দহে পইসওঁ। দেখিতে না পাওঁ। আমহে করি। শুনি।
ভবিষ্যৎ— করিব। জাইব। খেলাইবোঁ।

১৪। এ যুগেও ভাষায় 'যা' ও 'হু' ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্মভাববাচোর প্রচলন ছিল। যেমন :

তাতেকে সুকাল গেল মোর মহাদানে।

১৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাম-ধাতুর যথেষ্ট ব্যবহার ঘটেছে। যেমন :

হেন মনে পড়িহাসে। এবেঁ তাক উপেখহ কেহে।

তিন ॥ ছন্দ-বৈশিষ্ট্য [১]

ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় ছন্দ-বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। এই যুগের গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' প্রথম 'অক্ষরবৃত্ত' রীতির (তানপ্রধান) পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে। পয়ার, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, চৌপদী, একাবলী এবং মহাপয়ার জাতীয় ছন্দ-বন্ধ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। যেমন :

পয়ার—	পাখি নহোঁ তার ঠাঁই	উড়ী পড়ি জাওঁ।	৮ + ৬ = ১৪ মাত্রা
ত্রিপদী —	চান্দ সুরুজের	ভেদ না জানো	
	চন্দন শরীর তাএ।		৬ + ৬ + ৮ = ২০

দুই ॥ (আ) ॥ অন্ত্য-মধ্য বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(Linguistic Features of Late-Middle-Bengali-Language)

(১) কালসীমা :

অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার কালসীমা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন— ১৫০১ খ্রীঃ থেকে ১৭৬০ খ্রীঃ। তবে ড. সুকুমার সেন বলেছেন—শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা মনে রাখলে এর স্থিতিকাল ১৫০১ থেকে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ আর সেই সঙ্গে সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে এর স্থিতিকাল ধরতে হয় ১৫০১ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ।

(২) নিদর্শন :

অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক নিদর্শন প্রচুর। তার সংক্ষিপ্ত তালিকা হলো :

(১) বৈষ্ণবপদাবলী	:	জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রমুখের পদাবলী
(২) বৈষ্ণব (চৈতন্য) জীবনী	:	চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি
(৩) মঙ্গলকাব্য	:	মুকুন্দ চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখের গ্রন্থ
(৪) অনুবাদ কাব্য	:	কাশীরামদাস প্রমুখের গ্রন্থ
(৫) মুসলমানী সাহিত্য	:	দৌলত কাজী ও আলাওলের গ্রন্থ
(৬) শাক্তপদাবলী	:	রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রমুখের রচনা।

এই সব অসংখ্য রচনা থেকে অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন মেলে। আর তা থেকেই ভাষাতাত্ত্বিকেরা এই উপস্তরের বাংলা ভাষার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করেছেন :

১. বিস্তৃত আলোচনা— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বড়ুচণ্ডীদাস বিরচিত— ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা (শিলালিপি সং ১৯৯৭) পৃ. ৫২ - ৫৪

(৩) ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

এক ॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—পদার্থস্থিত একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত 'অ'-কারের লোপ। যেমন :—

প্রাণ্ ছনছন্ করে 'আমার্ মন্ ছনছন্ করে।
একলা ঘরে রৈতে নারি কিসের যেন ডরে॥

কিন্তু যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে এই লোপ ঘটে নি। যথা :

যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।

২. অন্ত্য-মধ্য স্তরের ভাষায় আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়েছে ও তার ফলে মধ্য স্বরের লোপ ঘটেছে। যেমন :

হল্‌দি— (হল্‌দি বরণ গোরাচাঁদ পড়া গেল মনে), অম্‌নি; গাম্‌ছা; পাগ্‌লা।
(´ = শ্বাসাঘাতের চিহ্ন)

৩. এই যুগে অপিনিহিতি ও বিপর্যাস ছিল। তারই ফলে 'ই' এবং 'উ' অনেকসময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে বসেছে— কখনো 'উ' 'হু' তে পরিবর্তিত হয়েছে—কখনো ব্যঞ্জনের পূর্বে বসা 'ই' বা 'উ' লোপ পেয়েছে। যেমন :

মাগু > মাউগ > মাগ [ম্ + আ + গ্ + উ > ম্ + আ + উ + গ্ > ম্ + আ + গ্]
ফাগু > ফাগু > ফাউগ্ > ফাগ্
কালি > কাইল > কাল্ [ক্ + আ + ল্ + ই > ক্ + আ + ই + ল্ > ক্ + আ + ল্]

এই উদাহরণ গুলিতে স্পষ্টতই দেখছি 'ই' বা 'উ' ব্যঞ্জনের পূর্বে বসেছে, কিন্তু 'ই' বা 'উ' লোপ পেয়েছে।

৪. এই যুগের ভাষায় অভিশ্রুতির নিদর্শনও মেলে। যেমন :

পাতিয়া > পাইত্যা > পাত্যা, পেতে।
খাইয়া > খা'য়া > খায্যা , খেয়ে।
বানিয়া > বাইন্যা > বেনে।

৫. এই যুগে সাধু ও চলিত ভাষায় 'নহ', মহ এবং ঢ-কার যুক্ত নাসিক্যধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে। যেমন :

বুঢ় > বুড়। কাহ্ন > কান। আহ্মার > আমার।

৬. অন্ত্যমধ্যযুগে শ্রুতিধ্বনি ('য়', 'ব' এবং 'হ')-এর প্রাবল্য এযুগের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন :

ছাওাল > ছাওয়াল। বাএ > বাহে।

৭. এ যুগের ভাষায় প্রচুর অর্ধতৎসম শব্দ পাওয়া যায়। যেমন :

ব্যবহার > ব্যাভার। ক্ষমা > খেমা। ভৎর্সন > ভর্ছন।

দুই ॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় একটি প্রধান রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো— সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে 'রা' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। যেমন— বক্সা বংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল। যুবতীরা কয়।

২। নির্দেশক বহুবচনে 'গুলি', 'গুলা' এবং তির্যক কারকের বহু বচনে 'দি', 'দিগ' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

কি কারণে দেবসভা বল এতগুলি।
মূলার সমান দন্ত গুলা।
তাহা দিগে ধরিত্রী আনহ মোর ঠাঁই।

৩। এই যুগে নাম-ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার ছিল— তৎসম শব্দও নাম-রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

শাস্তাইব। লাথাইয়া। আওসরি। বাখানিয়াছে।

৪। এই যুগের ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রচুর। যেমন :

পিয়ে (পান করে)। পুছে (জিজ্ঞাসাকরে)। জিনে (জয়করে)।

৫। এই যুগের ভাষায় নিম্নলিখিতভাবে কারক ও বিভক্তি চিহ্নিত হয়েছে :

কর্তৃকারক : শূন্য বিভক্তি— প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে।
কর্তৃকারক : এ বিভক্তি— এক এক মাঝিকে কিলায় তিন জনে।
কর্মকারক : কে বিভক্তি— বীরকে লাগিল ব্যথা।
করণ কারক : এ, তে বিভক্তি— মায়াতে মোহিত সব।
অপদান কারক : ত বিভক্তি— দূরত দেখিলে পুড়ে মন।
অপদান কারক : তে বিভক্তি— রাজাতে বিদায় মাঙ্গে।
অপদান কারক : কে বিভক্তি— ইহাকে অধিক তুমি জানিও তাঁহার।
সম্বন্ধপদে : 'র', 'ক', 'কর', 'কার', ' কের' প্রভৃতি বিভক্তি মেলে—
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল।
অধিকরণ : 'এ', 'তে', 'রে', 'কে' বিভক্তি—
তোমার কুটীরে হৈল মোর দরশনে।
সেউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে। 'এথাকে আনহ'।

৬। এযুগেও 'ইল' দিয়ে অতীত কাল এবং 'ইব' দিয়ে ভবিষ্যত কাল গঠিত হয়েছে। যেমন—

অতীত : করিল, পূজিল, জানিল, ছাড়িল।
ভবিষ্যত : থাকিবে, পারিবে, মাখিবে, রাখিবে, বাড়িবে, ছাড়িবে।

তিন।। ছন্দ-বৈশিষ্ট্য

অন্ত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ছন্দ-বন্ধের আরও বহু বিচিত্র রূপ লক্ষ্য করা গেল। আদি মধ্য যুগে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, একাবলী ছন্দ ছিল। এ যুগেও সেগুলির বহু ব্যবহার ঘটলো। কিন্তু ছন্দ-রীতির নতুন নমুনা মিললো অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে লোকরীতির ছন্দ স্বরবৃত্তের (লোচনদাস, ভারতচন্দ্র, নরহরি চক্রবর্তীর রচনায়)। এছাড়া এসময় ব্রজবুলি কবিতায় মাত্রাবৃত্তের পর্যাপ্ত ব্যবহার দেখা গেল। বাংলা কবিতায় ভারতচন্দ্র, নরহরি চক্রবর্তী মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার দেখালেন। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে তৃণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দের নিখুঁত ব্যবহার করলেন। ছন্দের শিল্পশালা গড়েছেন ভারতচন্দ্র।

চার।। বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ ও শব্দ ভাণ্ডারের পুষ্টি

এ যুগের ভাষায় প্রচুর বিদেশী শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে। এ সময় মুসলমা'নেরা দেশ শাসন করছিলেন। তাঁদেরই মাধ্যমে বহু আরবী, ফার্সী, তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত

হয়েছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' দু-চারটি আরবী, ফার্সী শব্দ ছিল। এ সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে মানুষের মুখে ও সাহিত্যে তা ব্যবহৃত হলো। এক ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তার নিদর্শন প্রচুর। যেমন :

আরবী ফার্সী : আইন, আদমী, কেতাব, কেতাবে, আজব, বাজনা, আতর, কামান, খেয়াল, আন্দাজ, নমাজ, নজরানা, তাজ্জব, লস্কর।
তুর্কী : বিবি, বেগম, খাঁ, খাতুন, বাবা, বন্দুক, চাকু। লাশ, দারোগা, বারুদ, কাঁচি, কুলি বোয়াক, উর্দু।
পর্তুগীজ : মস্করা, জানালা, গামলা, তামাক, আতা, পেঁপে, পেয়ারা। আনারস, পাঁউ, গন্ত, বোতাম, বোতল, চাবি, কামরা।

পাঁচ ॥ ব্রজবুলির প্রচুর ব্যবহার

এই সময় মৈথিলী বিদ্যাপতির পদ এদেশে কীর্তন গানে খুব জনপ্রিয় ছিল। ব্রজবুলি হলো মৈথিলী, অবহট্‌ঠ ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে একটি 'সাহিত্যিক কৃত্রিম ভাষা'। অন্ত্যমধ্য যুগে বৈষ্ণব কবিরা বাংলা ভাষার সমান্তরালে এই ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে গোবিন্দদাস, জগদানন্দ, নরহরি চক্রবর্তী ও যদুনন্দন প্রমুখের খ্যাতি ছিল সর্বজন বিদিত। একটি ব্রজবুলি পদাংশ উদ্ধৃত হলো :

কণ্টক গাড়ী কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।। — গোবিন্দ দাস।

□ তিন □ আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(Linguistic Features of Modern Bengali Language)

(১) ভূমিকা

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব দশম শতাব্দীতে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষা নানা ভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। এই হাজার বছরের ইতিহাসকে পণ্ডিতেরা তিনটি যুগে বা স্তরে বিন্যস্ত করেছেন :

ক. আদিস্তর বা প্রাচীন বাংলা (৯০০-১৩৫০ খ্রী)
খ. মধ্যস্তর বা মধ্য বাংলা (১৩৫১-১৭৬০/১৮০০ খ্রী)
গ. আধুনিক স্তর বা আধুনিক বাংলা (১৭৬১/১৮০১ থেকে আজ পর্যন্ত)।

তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

(২) কালসীমা

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধ হইতে বাংলার আধুনিক স্তরের আরম্ভ'। তবে কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু সাল ১৭৬০ খ্রীঃ থেকেই এর সূচনা ধরতে চান। সম্প্রতি স্থির হয়েছে, আধুনিক বাংলার সূচনা ও বিস্তৃতি কাল হলো— 'অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আজপর্যন্ত'।

(৩) নিদর্শন

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয় ও ভাবের বিচারে সর্বতোমুখী প্রসার লাভ করেছে। সেগুলি হলো :

১. কাব্য কবিতা (মহাকাব্য আখ্যানকাব্য গীতিকাব্য) — মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল, অমিয়, বিষ্ণু, সুনীল।

২. গদ্যরচনা — উপন্যাস — বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, তারাশঙ্কর, মানিক, মহাশ্বেতা।
— নাটক — মধুসূদন, গিরিশ, রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, বিজন, শম্ভু।
— ছোট গল্প — রবীন্দ্র প্রভাত শরৎ মানিক সুনীল, অমিয় চক্রবর্তী।
— প্রবন্ধ — বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শ্রীকুমার, সুবোধ, সুকুমার সেন, ক্ষুদিরাম দাস।
— জীবনী — রবীন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার।

(৪) আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বাংলা ভাষার তিনটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ্য করবার মতো—

১. লেখ্যভাষা ও কথ্যভাষার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য।
২. লেখ্যভাষায় কবিতা রচনার পাশে গদ্যে বিবিধ রচনার বিকাশ।
৩. ইংরেজী শব্দের প্রচুর ব্যবহার।

প্রধানত গদ্যরীতিতে দুটো রূপ গড়ে উঠেছে—

ক. সাধুরীতি
খ. চলিতরীতি (কথ্যরীতি)।

সাধুরীতিতে দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য লেখা চলছিল। উনিশ শতকে সাধুরীতি পরিপুষ্টি লাভ করে। পরবর্তীকালে চলিত গদ্যের ধারাটি সাহিত্য রচনার বাহন হয়ে উঠে। তাই এই যুগের ভাষার আলোচনায় সাধুরীতি ও চলিত রীতির কেউ কেউ পৃথক পৃথক, কেউ কেউ পাশাপাশি আলোচনা করেছেন।

এক ॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষ্য ও অনুসর্গের পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। কিন্তু চলিত (কথ্য) ভাষায় সেগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ দেখা যায়। যেমন—

সাধু > চলিত
ক্রিয়া : করিতেছি > করছি, করিয়াছিলাম > করছিলাম, করিব > করব।
বিশেষ্য : বানিয়া > বেনে, জালিয়া > জেলে, পটুয়া > পেটো।
সর্বনাম : তাহা > তা, তাঁহার > তাঁর, উহা > ও, উহার > ওর।
অনুসর্গ : সহিত, সমভিব্যাহারে > সঙ্গে, হইতে > হতে, অপেক্ষা > চেয়ে।

২. সাধুভাষায় সংস্কৃত, তৎসম, সন্ধি ও সমাসবদ্ধ এবং আভিধানিক শব্দের প্রাচুর্য; কিন্তু চলিত ভাষায় সহজ সরল ও বহু প্রচলিত শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সাধুভাষায় বাক্যের জটিলতা, শব্দের দুর্বোধ্যতা, প্রকাশের গুরু গম্ভীরতা লক্ষণীয়। কিন্তু চলিত ভাষা এই সব গুলিকে পরিহার করে চলতে চায়। চলিত ভাষায় সংস্কৃতের পরিবর্তে তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রাধান্য। তার চাল লঘু ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাতে আছে কৃত্রিমতামুক্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য।

৩. অভিশ্রুতির প্রাচুর্য। মধ্যযুগের বাংলায় ছিল অপিনিহিতি ও বিপর্যাস। আধুনিক বাংলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতির পরের স্তর অভিশ্রুতি। যেমন—

করে (করিয়া > কইর‍্যা > করে)। দেখিয়া, শুনিয়া > শুইন্যা > শুনে।
পড়িয়া > পেড়ে। বইল > বল।

৪. আধুনিক বাংলা ভাষার চলিত রীতিতে স্বরসঙ্গতি বা স্বরের উচ্চতাসাম্য বা প্রগত্যর্থক স্বরসঙ্গতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন—
বিলাতি > বিলিতি। দেশি > দিশি। বিলাতি > বিলিতি, কুয়া > কুয়ো।

৫. এ যুগের ভাষায় ব্যঞ্জন সন্ধি বা সমীভবনের প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন—
পদ্ম > পদ্দ। গল্প > গপ্প। কর্তা > কত্তা।

৬. ধ্বনিবিপর্যয় এ যুগের ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। যেমন—
আলনা > আনলা; বারানসী > বেনারসী।

৭. স্বরাগম ও ধ্বনিলোপ এই যুগের ভাষায় দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণ। যেমন—
স্কুল > ইস্কুল; স্পর্ধা > আস্পর্ধা; সত্য > সত্যি, বটি > বঁটি।
নাতিনী > নাতনী; উদ্ধার > ধার।

৮. শব্দার্থ পরিবর্তন (শব্দের অর্থবিস্তার, অর্থসংকোচ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ), আধুনিক বাংলাভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন—
'কালি' = আদি অর্থ—তরল কালো রং; পরবর্তী অর্থ—যে কোনো রং এর তরল রূপ।
'ভৃত্য' = আদি অর্থ—ভরণের যোগ্য; সংকুচিত অর্থ—চাকর।

দুই ॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। আধুনিক বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রচুর। যেমন—
গান করা, বাজনা বাজানো, বসে পড়া, শুয়ে থাকা,
প্রশ্ন করা, উত্তর দেওয়া, নৌকা বাওয়া, বিলম্ব করা।

২। ড. সুকুমার সেন বলেছেন,— অ-কারান্ত কোনো কোনো নিজন্ত ধাতুর রূপ অনিজন্ত হয়ে দাঁড়ালো। যেমন—
পেলা, ফেলা (পেলায়, ফেলায়) > ফেল (ফেলে),
খলা (খেলায়) > খেল (খেলে), পৌঁছা > পৌঁছ।

৩। আধুনিক বাংলায় সংযোজক অব্যয়রূপে 'ও', 'এবং' শব্দের প্রচুর ব্যবহার আছে। তবে সাধারণত মনে করা হয় 'ও' দুটি পদকে যোগ করে। 'এবং' দুটি বাক্যকে যোগ করে। ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও এদের ব্যবহার পর্যাপ্ত। যেমন—
রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে গিয়েছিল এবং গোদাবরী তীরে তারা কুড়ে বেঁধেছিল।

৪। আধুনিক বাংলায় নঞর্থক অব্যয় 'না', 'নি', 'নাই' প্রভৃতির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। সাধারণত এগুলি সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। এই রীতিটি আধুনিক-পূর্ব যুগে ছিল না। এর উদাহরণ :
সে খেল না। (সমাপিকা ক্রিয়া)।
সে না খেয়ে চলে গেল (অসমাপিকা ক্রিয়া)।

৫। আধুনিক বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটি মাত্র সরল বাক্যে প্রকাশ করার রীতি দেখা যায়। যেমন—

একাধিক বাক্য = সে গান গাইল। সে পুরস্কার পেল। সে বাড়ি ফিরল। সে মাকে দেখাল।

একটি সরল বাক্য = সে গান গেয়ে পুরস্কার পেয়ে বাড়ি ফিরে মাকে দেখাল।

৬। আধুনিক বাংলায় পদ গঠনের বিচিত্র বিধি। পণ্ডিতেরা বলেছেন কর্তৃপদ তিন রকমের (১) বিভক্তিহীন (২) 'এ' বিভক্তি যুক্ত; (৩) নির্দেশক প্রত্যয় যুক্ত। যেমন—

রাস্তায় লোক চলেছে। পাগলে কি না বলে। লোকটা গেল কোথায়?

তিন॥ বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ

বিদেশী শব্দ গ্রহণ— আধুনিক ভাষায় প্রচুর বিদেশী শব্দ ঢুকছে—সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য গত কারণে। যেমন—

ইংরেজী শব্দ— গ্লাস, চেয়ার, টেবিল, রেডিও, ইউনিভার্সিটি, রিস্টওয়াচ।

পর্তুগীজ শব্দ— আলপিন, আলমারি, কেরানী, চাবি।

এছাড়া বহু বিদেশী উপসর্গ বাংলা শব্দে যুক্ত হয়েছে। যেমন :

ফি (ফি বছর) যে (বেয়াদপি), হাফ (হাফটিকিট), ফুল (ফুলহাতা)।

চার॥ ছন্দ-বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্যে ছন্দের দ্যোতনা আমাদের মুগ্ধ করে। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত—এই তিন প্রধান ছন্দ এবং অমিত্রাক্ষর, গদ্য কবিতার ছন্দ প্রভৃতি ছন্দ-বন্ধ বাংলার ছন্দের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ ও সুসমৃদ্ধ করেছে॥

□ 'সংস্কৃতভাষা বাংলাভাষার জননী' কি না □

বাংলাভাষার জন্ম 'মাগধী-অপভ্রংশ' থেকে— সংস্কৃতভাষা বা মাগধী-প্রাকৃত থেকে নয়।

বাংলাভাষার জন্ম নিয়ে চলিত ধারণাটি হলো—'সংস্কৃতভাষাই বাংলাভাষার জননী'— অর্থাৎ সংস্কৃতভাষা থেকেই বাংলাভাষার জন্ম হয়েছে। এই ধারণার মূলে আছে প্রধানত ৪টি কারণ :

১. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আধিক্য।

২. তদ্ভব শব্দ বা খাঁটি বাংলা শব্দগুলির সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের গভীর ও নিকট সম্পর্ক।

৩. ভাষাতত্ত্বগত অধ্যয়নে প্রাপ্ত সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার অন্তরঙ্গতা।

৪. সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের গৌরবে গৌরব লাভের মানসিকতা।

— এজন্যেই 'সংস্কৃতভাষা যে বাংলাভাষার জননী'— এই সিদ্ধান্তই ছিল সর্বজন স্বীকৃত।

কিন্তু এখন বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা করেছেন। তার উৎস নিয়ে এখন প্রচুর অনুসন্ধান হয়েছে। তাতে স্থির হয়েছে যে, সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা অতি নিকট সম্পর্ক অবশ্যই আছে— কিন্তু সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকেই যে বাংলা ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, একথা ঠিক নয়।— কারণ ভাষাবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, প্রাচীন-ভারতীয়-আর্যভাষা-'বৈদিক সংস্কৃতে'-র যে কথ্যরূপ—তা থেকে জন্ম নিয়েছে

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা 'প্রাকৃত', সেই প্রাকৃতেরই মধ্যে অন্তে নানা স্তর পরম্পরা—নানা আঞ্চলিক রূপ—তেমন একটি আঞ্চলিক রূপের স্তর থেকেই জন্মেছে 'নব্য ভারতীয় আর্যভাষা'— বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি। অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত কথ্য (প্রাচীন ভারতীয় আর্য) > প্রাকৃত আঞ্চলিক (মধ্যভারতীয় আর্য) > বাংলা প্রভৃতি (নব্য ভারতীয় আর্য)।

সুতরাং 'বাংলা ভাষার জননী' বলতে সরাসরি সংস্কৃতকে বলা যাচ্ছে না। তার কারণ :

১. সংস্কৃত নামক ভাষাটি বৈদিক ভাষার পরবর্তীকালে সৃষ্ট— তা একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা।— তা কখনো কথ্যভাষা ছিলো বলে জানা যায় নি। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে আর্যভাষাভাষী একটি জনগোষ্ঠী ভারতে আসে। তারা যে-ভাষায় কথা বলতো, তার নাম 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য'।

এই ভাষারই একটি শিষ্টরূপ আছে 'বৈদিক সাহিত্যে'। সেই বৈদিকভাষাই ক্রমশ বিবর্তিত হতে থাকে। তার গঠনে, রূপে ও স্বরূপে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। তখন তাকে একটি সুষ্ঠু রূপ দেবার জন্যেই বৈদিক ভাষার সংস্কার ঘটে। আর সেই সংস্কারকৃত ভাষার নাম হয় 'সংস্কৃত'। কিন্তু তা সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমরা শিথিলভাবে এই বৈদিক ও সংস্কৃতকে 'সংস্কৃত' বলে অভিহিত করি। এই সংস্কারকৃত সংস্কৃতেরও প্রচুর নিদর্শন আছে সাহিত্যে। সাহিত্যের ভাষা বলেই এই সংস্কৃতের কোনো বিবর্তন হয় নি। নানা কারণেই ভাষা বিবর্তিত ও বিবর্ধিত হয়,— বহু নতুন নতুন শব্দ, প্রত্যয়, ধাতু তাতে ঢুকে পড়ে। পুরাতন শব্দের অর্থ বদলে যায়; কখনো অর্থ পরিত্যক্ত হয়; শব্দরূপ বা ধাতুরূপের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার এরকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে নি। ফলে সংস্কৃত ভাষা 'মৃত' ভাষায় পরিণত হয়। কিন্তু কোনো মৃত ভাষা থেকে অন্য কোনো ভাষার জন্ম হতে পারে না। তাই সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয় নি।

অপরপক্ষে সেকালে বৈদিক ভাষা ছিল জীবন্ত ভাষা। কারণ সে ভাষার একটা কথ্য রূপ ছিল। ভাষাবিজ্ঞানীরা সেই কথ্যরূপের বিবর্তনের মধ্যেই মধ্যবর্তী স্তর,—এবং তা থেকে নব্যস্তরের সন্ধান পেয়েছেন। অর্থাৎ বৈদিক-কথ্যরূপ > মধ্যস্তর (প্রাকৃত-অপভ্রংশ -অবহট্‌ঠ) > অন্ত্যস্তর— বাংলা . . . . প্রভৃতি।

২. জীবন্ত ভাষা নদীর স্রোতের মতো প্রবহমানা। তাতে যেমন শাখানদী জন্মায়, তেমনি উপনদীও মেশে। আর সে নদী কোনো অঞ্চল-বিশেষে বিশাল বড়ো বাঁক নিলেই, নদীর নামটি পাল্টে যায়। ভাষার মধ্যেও তেমনি বিশাল পরিবর্তন এলে তারও নতুন নামকরণ হয়। তাই বৈদিক-কথ্যভাষাই খ্রী: পূ: ষষ্ঠ শতকে নতুন নামে চিহ্নিত হলো 'মধ্যভারতীয় আর্যভাষা' বা 'প্রাকৃত' বলে। এই প্রাকৃতেরও নানা স্থানে নানা নাম। অঞ্চল বিশেষেই সেই নাম। তেমনি একটি নাম— 'মাগধী প্রাকৃত'। কিন্তু এই মাগধী প্রাকৃত থেকেও বাংলা ভাষার জন্ম হয় নি। কারণ মাগধী প্রাকৃতের প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলায় অবিকৃত দেখা যায় না।

তবে এই মাগধী প্রাকৃতের নানা স্তরভেদ আছে। তার একটি স্তরের নাম 'মাগধী অপভ্রংশ'। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ভারত ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রীয়ার্সন বলেছেন, এই মাগধী অপভ্রংশ থেকেই বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষা- গুলির জন্ম। তবে এই মাগধী অপভ্রংশের কোনো লিখিত (সাহিত্যিক) প্রমাণ মেলেনি। সেজন্যে একদল ভাষাবিজ্ঞানীরা মাগধী অপভ্রংশের অস্তিত্বকে উড়িয়ে দিতে চান। তাঁদের মতে, 'কথ্য-প্রাকৃত থেকেই বাংলার জন্ম'।

আর এক বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 'গৌড়ীয় অপভ্রংশ' থেকেই বাংলার জন্ম। এবং তা জন্মেছে মাগধী প্রাকৃত থেকেই। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতের

ব্যাকরণে এই 'গৌড়ীয়-রীতি'টির উল্লেখ আছে। 'গৌড়ীয় রীতি' মানে গৌড়বঙ্গের লোকমুখের ভাষা। সুতরাং শহীদুল্লাহর মতটি মানলেও সংস্কৃত ভাষা যে বাংলা ভাষার জননী নয়, তা স্বীকৃত হয়ে পড়ে।

তবে অধিকাংশ পণ্ডিতই আচার্য সুনীতিকুমারের মতটি মেনে নিয়েছেন। বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' (রচনাকাল খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী), আদি-মধ্যযুগের একমাত্র বাংলা সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী), তারপর অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী', জ্ঞানদাস প্রমুখের 'পদাবলী', নানা চৈতন্যজীবনী ও সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যের ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃত বা মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলার জন্ম হয়নি— বাংলার জন্ম হয়েছে 'মাগধী অপভ্রংশ' থেকে। সুনীতিকুমার তার প্রমাণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে' ইত্যাদি চরণটির সর্বপ্রকার প্রাচীন ভাষারূপ নির্মাণ করে। যেমন ঃ

আধুনিক বাংলা	ঃ গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
মধ্যস্তরের বাংলা	ঃ গান গায়্যা নাও বায়্যা কে আস্যে পারে।
প্রাচীন বাংলা	ঃ গাণ গাহিআ নাব বাহিআ কে আইশই পারহি।
মাগধী অপভ্রংশ	ঃ গাঁণ গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ কই আবিশই পারহি।
মাগধী প্রাকৃত	ঃ গাণং গাধিঅ নাবং বাহিঅ কনে নাবিশদি পারধি।
বৈদিক (কথ্য)	ঃ গানং গাথয়িত্বা নাবং বাহয়িত্বা ককঃ আবিশতি পারধি।

— এ থেকেও বুঝি, মাগধী-অপভ্রংশের সঙ্গেই বাংলা ভাষার সর্বাধিক গভীর যোগ। এজন্যেই বাংলাভাষার জননী হিসেবে মাগধী-অপভ্রংশের নামই সাম্প্রতিক ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু , ডঃ রামেশ্বর শ, অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ স্বীকার করেছেন। তাই সংস্কৃতকে বাংলা ভাষার জননী বলা চলে না॥

৪ | বাংলা উপভাষা

□ এক □ উপভাষা : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

'A Dictionary of Linguistics'-এ 'উপভাষা'র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে' :

> A specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronounciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language.[১]

এ থেকে বুঝি :

> উপভাষা হলো—একটি ভাষার অন্তর্গত এমন একটি বিশেষ রূপ, যা এক একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত থাকে, যার সঙ্গে সেই আদর্শ ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

ভাষাচার্য সুকুমার সেন বলেছেন :

> 'কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষাগুলিকে উপভাষা বলে।'[২]

তাঁর মতে, ভাষার কাজে বিশেষ একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি-ব্যবহারকারী জনমণ্ডলীকে বলে 'ভাষা-সম্প্রদায়'। কিন্তু এক একটি ভাষাসম্প্রদায় যে-ভাষার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করে, সেই ভাষার রূপ সর্বত্র এক রকম নয়। যেমন—'বাংলা ভাষাসম্প্রদায়ে'র কথা ধরা যাক্। সমগ্র পশ্চিম বাংলা ও পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) মিলে যে বিরাট অখণ্ড বাংলাদেশ— তার সর্বত্রই যে-ভাষা ব্যবহৃত হয়, তার নাম 'বাংলা ভাষা'। এই হলো 'ভাষা সম্প্রদায়'।

কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যায়—এই অখণ্ড বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে পুরুলিয়ার লোকে যে ভাবে বাংলা বলে, পূর্বাংশে ময়মনসিংহের লোকেরা সেভাবে বলে না। উত্তরাংশে কোচবিহারের লোকেরা আরও অন্য রকম করে বলে। তাহলে—পুরুলিয়ার মানুষের মুখের ভাষা এক রকম, ময়মনসিংহের মানুষের মুখের ভাষা আর এক রকম, কোচবিহারে মানুষের মুখের ভাষা আরো অন্য রকম। তেমনি শ্রীহট্টের মানুষের মুখের ভাষা আরো আলাদা এক রকম। অথচ সবই তো বাংলা ভাষা। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক-পার্থক্য-যুক্ত লৌকিক বা স্থানীয় কথ্যভাষা— তাকেই মূল ভাষাটির 'উপভাষা' বলে।

যেমন : বাঁকুড়ার উপভাষা, কোচবিহারের উপভাষা, ময়মনসিংহের উপভাষা, পুরুলিয়ার উপভাষা, দক্ষিণ ২৪-পরগণার উপভাষা।

সুতরাং উপভাষার বৈশিষ্ট্য হলো—

১। উপভাষা একটি আদর্শ ভাষার একান্ত আঞ্চলিক রূপ।

১. A Dictionary of Linguistics (London 1970) : P. 56
২. ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৭১) পৃ. ৫

২। উপভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধানভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৩। উপভাষার এই পার্থক্য তার আদর্শ ভাষাকে ছাড়িয়ে যায় না। (ছাড়িয়ে গেলেই তা পৃথক ভাষা বলে গণ্য হবে)।

৪। উপভাষা প্রধানত অঞ্চল-বিশেষে মানুষের মুখের ভাষা— দৈনন্দিন জীবন যাপনের ভাষা।

৫। তবে 'উপভাষায় কোনো ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ দোষ বা ভুল প্রয়োগ টিকতে পারে না।'

৬। এ পর্যন্ত দেখছি, উপভাষা ব্যবহারকারী মানুষেরা বৃহত্তর কারণে—(ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক) লেখার সময়, বা বিশেষ স্থানে বক্তৃতার সময় উপভাষা পরিত্যাগ করে আদর্শ ভাষাটিকেই ব্যবহার করে। যেমন— স্কুলে বা অফিসে দরখাস্ত লেখার সময় বা দূরস্থিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে চিঠি পত্র আদানপ্রদানে।

৭। সম্প্রতি, আঞ্চলিক উপভাষাতেও সাহিত্য লেখা হচ্ছে। আঞ্চলিক উপভাষার লোকগানগুলি খুব জমে উঠছে। কিছু দিন আগেও কোনো কোনো চরিত্রের মুখেও আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। এখন উপভাষাকে ভিত্তিকরে বহু সাহিত্য লেখা হয়েছে।

৮। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই উপভাষা আছে।

৯। উপভাষায় রচিত প্রাচীন মৌখিকসাহিত্যকে সাধারণত 'লোক-সাহিত্য' বলে।

১০। উপভাষার শব্দাবলী থেকে অনেক ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক মূল্যায়ন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

১১। উপভাষার মধ্যেই ভাষার যথার্থ প্রাণশক্তি নিহিত। ম্যাকস্‌মুলারের ভাষায় : 'The real and natural life of a language is its dialects'.

□ দুই □ বাংলা ভাষার উপভাষা বিভাগ

বাংলা ভাষার উপভাষা প্রধানত পাঁচটি—

১. রাঢ়ী
২. ঝাড়খণ্ডী
৩. বরেন্দ্রী
৪. বঙ্গালী
৫. কামরূপী বা রাজবংশী ॥

□ তিন □ ১॥ 'রাঢ়ী উপভাষা'

(ক) Area বা এলাকা :

'রাঢ়ী উপভাষা' প্রধানত পশ্চিম বাংলার বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত।

(খ) বিস্তারগত সূক্ষ্মবিভাগ :

বাংলা ভাষার উপভাষা গুলির মধ্যে রাঢ়ীর বিস্তার সর্বাধিক। সেজন্যে রাঢ়ী উপভাষার মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায়। যেমন—'পূর্ব বাঁকুড়া'র লোকেরা যেভাবে কথা বলে, 'হাওড়া'র লোকেরা সেভাবে বলে না। আবার 'হুগলী'র লোকেরা যেভাবে কথা বলে, 'দক্ষিণ ২৪-পরগণা'র লোকেরা সেভাবে কথা বলে না। তাই রাঢ়ী উপভাষাকেও কেউ কেউ চারভাগে ভাগ করতে চান :

অ। পূর্ব রাঢ়ী—কলকাতা, ২৪ পরগণা, বর্ধমান (পূর্ব), হাওড়ায় প্রচলিত কথ্য ভাষা।
আ। পশ্চিম রাঢ়ী—বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, বীরভূম, বর্ধমানে (পশ্চিম) প্রচলিত কথ্য।
ই। উত্তর রাঢ়ী— নদীয়া, মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কথ্য।
ঈ। দক্ষিণ রাঢ়ী— দক্ষিণ পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ হুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রচলিত কথ্য।

আবার কেউ কেউ অন্যভাবেও বিভাগ নির্দেশ করেছেন।
কেউ কেউ 'পূর্ব রাঢ়ী' ও 'পশ্চিম-রাঢ়ী' নামেও দুটিবিভাগ করেছেন।[২]

(গ) রাঢ়ী উপভাষার উদাহরণ :

আদর্শ রাঢ়ী : হতভাগা ছেলে! তোকে কখন বলেছি— গাইটা দুইয়ে নিয়ে বাজারে যা। ও ছেলের কথা শোনো, বলে কি না, শীত করছে! ঘাড়টা ধরে নিয়ে আসবো। মারবো গালে চড়।

পশ্চিম রাঢ়ী : হতভাগা ছেলা! তুখে কখন বল্যেছি, গাইটাকে দুয়্যে দিয়ে বাজারে যা। ত ছেলা কুনও কথা শুনবেক নাই। বল্ছে, জাড়াচ্ছে বটে। ঘাড় ধর‍্যে লিয়ে আইসব। গালে চড়'ই দিব।

রাঢ়ী উপভাষাই আদর্শ বাংলাভাষার উৎস স্থল। আজকে সারা বাংলায় যে-ভাষা 'আদর্শ' রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা এই রাঢ়ী উপভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

১. বাঁকুড়া'র উপভাষা—দ্র. ডি. কা.
২. রাঢ়ের প্রসঙ্গকথা (ব. বি. ১৯৮৯)— দ্র. ডী. কা.। রাঢ় পরিচিতি

(ঘ) রাঢ়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এক ॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Phonological features) :

১. রাঢ়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য—'অ' স্থলে 'ও' উচ্চারণ। যেমন :
হল > হলো। মত > মতো। বড় > বড়ো। অতুল > ওতুল। অজিত > ওজিত। মধু > মোধু। তথ্য > তথ্যো। পাগল > পাগোল। মন > মোন। প্রমাণ > প্রোমাণ। বন > বোন (জঙ্গল)।

২. রাঢ়ী উপভাষার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য— 'অভিশ্রুতি'। অর্থাৎ শব্দ মধ্যে অপিনিহিতির 'ই' বা 'উ' ধ্বনি লোপপাবে ; অথবা ই, উ অন্য স্বরের প্রভাবে লোপ পাবে, অথবা অন্য স্বরের সঙ্গে মিশে নতুন রূপ পাবে— সেই হল অভিশ্রুতি।
যেমন : করিয়া > কইর‍্যা > করে, চারি > চাইর > চার, বহিন > বইন > বোন,

৩. রাঢ়ী উপভাষায় পদের আদিতে শ্বাসাঘাত প্রবণতা আছে এবং তারই ফলে পদের মধ্যবর্তী ও অন্তঃস্থিত মহাপ্রাণবর্ণ[১] অল্পপ্রাণবর্ণে[২] পরিণত হয়। যেমন :
দুধ > দুদ, বাঘ > বাগ।

৪. রাঢ়ী উপভাষায় শব্দান্তস্থিত অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন :
কাক > কাগ, ছাত > ছাদ, উপকার > উবগার।

৫. রাঢ়ী উপভাষায় নাসিকীভবন ও স্বতোনাসিকীভবনের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন :
পুস্তিকা > পুত্থিআ > পুথি— পুঁথি। সূচ > ছুঁচ, পেচক > পেঁচা।
ইষ্টক > ইট— ইঁট। তেমনি—চাঁদ (< চন্দ্র), বাঁশ, আঁটা, চাঁক।
বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার প্রচুর আনুনাসিকের আগম— চাঁ হঁয়েছে না কি বঁ। (= চা হয়েছে কি, ওহে)। ফুঁটাই মরে যাঁবি (= দেহ ছিন্নভিন্ন বা বিদীর্ণ হয়ে মারা যাবি)।

৬. রাঢ়ী উপভাষায় অনেকসময়ই ন > ল, ল > ন হয়। যেমন :
ন > ল— নৌকা > লৌকা, নয় > লয়, নড়া > লড়া।
ল > ন— লংকা > নংকা, লুচি > নুচি, লোহা > নুয়া (নোহা), লেবু > নেবু, লাউ > নাউ, লবন > নুন, গুলো > গুনো।

৭. রাঢ়ী উপভাষায় অনেক সময় শব্দ মধ্যস্থ পাশাপাশি অবস্থিত বিষমধ্বনির সমধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। যেমন :
বিলাতি > বিলিতি। দেশি > দিশি।

৮. রাঢ়ী উপভাষায় অনেক সময় 'হ' কার লোপ পায়। যেমন :
তাহার > তার, কহি > কই, দহ > দ।

দুই ॥ রাঢ়ী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রাঢ়ী উপভাষার রূপতত্ত্বগত নানা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান :

১. মহাপ্রাণবর্ণ = বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ = খ, ঘ; ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ; ফ, ভ।
২. অল্পপ্রাণবর্ণ = বর্গের ১ম ও ৩য় বর্ণ = ক, গ, চ, জ, ট, ড; ত, দ; প, ব।
৩. অঘোষ ধ্বনি = বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ = ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ।
৪. ঘোষ ধ্বনি = বর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ণ = গ ঘ ঙ, জ ঝ ঞ, ড ঢ ণ, দ ধ ন, ব ভ ম।

১। রাঢ়ী উপভাষায় কর্তৃকারকের বহুবচনে 'গুলি', 'গুলা', 'গুলো' এবং অন্যান্য কারকের বহুবচনে 'দের' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন :

গুলি, গুলা, গুলো— ছেলেগুলি, মেয়েগুলা, পাখিগুলো। ছেলেগুলি ভাত খায়।
দের— আমাদের, তাদের, রাখেদের, পাখিদের, তোদের।
তোদের দিয়ে কাজটা হবে (করণ কারকে)।
আমাদের খেতে দাও (কর্মকারকে)।

২। রাঢ়ী উপভাষায় অধিকরণ কারকে 'এ' বা 'তে' বা 'এতে' বিভক্তির যোগ হয়। যেমন :

এ— ঘরে এসো। বনে গাছ নেই। জলে মাছ আছে। দেশে দেশে মোর ঘর আছে।
তে— বাড়িতে এসো। বাঁকুড়াতে দেখে এলাম।
এতে— ঘরেতে ভাত নেই। জলেতে মাছ আছে।

৩। রাঢ়ী উপভাষায় মুখ্য-কর্মে[1] কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। কিন্তু গৌণকর্মে[2] 'কে' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—

শিক্ষকমশায় ছাত্রদেরকে ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।
—এখানে মুখ্য কর্ম— 'ব্যাকরণ' : 'ব্যাকরণে' কোনো বিভক্তি নেই।
—এখানে গৌণকর্ম— 'ছাত্রদেরকে' : ছাত্রদেরকে শব্দে 'কে' বিভক্তি যোগ হয়েছে।

অন্য উদাহরণ :

(ক) ছেলেটাকে (গৌণকর্ম) একটা বল্ (মুখ্য কর্ম) দাও।
(খ) তোমাকে (গৌণকর্ম) গান (মুখ্যকর্ম) শোনাবো।
(গ) বাবা, আমাকে (গৌণকর্ম) একবার বাড়ি (মুখ্যকর্ম) লইয়া যাও।

৪। রাঢ়ী উপভাষায় কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি নিম্নরূপ :

(ক) বর্তমান কালে

উত্তম পুরুষে— 'ই' বিভক্তি : আমি গান করি। আমরা আসি।
মধ্যম পুরুষে— 'অ', 'ও', 'ইস্' : তুমি গান কর। তোমরা এসো। তুই আসিস্।
প্রথম পুরুষে— 'এ', 'এন' : সে গান করে। তিনি আসেন।

(খ) অতীত কালে :

উত্তম পুরুষে— উম, আম বিভক্তি : আমি গান করলুম। গান গেয়েছিলুম। গেয়েছিলাম।
মধ্যম পুরুষে— এ, এন, ই বিভক্তি : তুমি গান করেছিলে। আপনি গেয়েছিলেন। তুই গেয়েছিলি।
প্রথম পুরুষে— অ, এন বিভক্তি : সে গান করেছিল। তিনি গেয়েছিলেন।

(গ) ভবিষ্যৎ কালে

উত্তম পুরুষে— ব, বো, ও : আমি গান করবো। আমরা গাবো।
মধ্যম পুরুষে— বে, বেন, বি : তুমি গান করবে। আপনি গান করবেন। তুই গান করবি।
প্রথম পুরুষে— বে, বেন : সে গান করবে। তিনি গান করবেন।

---

১. মুখ্য কর্ম : সকর্মক ক্রিয়াকে 'কী' প্রশ্নের উত্তরে যা পাই, তা-ই মুখ্যকর্ম।
২. গৌণকর্ম : সকর্মক ক্রিয়াকে 'কাকে' প্রশ্নের উত্তরে যা পাই, তা-ই গৌণ কর্ম।

৫। যৌগিক ক্রিয়া গঠনের পদ্ধতি :

আচার্য সুকুমার সেন বলেন, রাঢ়ীতে যৌগিক ক্রিয়াপদে (ই) অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া অসম্পন্ন কালের এবং (ইয়া) অন্ত অসমাপিকা দিয়া সম্পন্ন কালের পদ গঠিত হয়। যেমন : করিয়াছে > করেছে, করিতেছিলি > করছিল, করিয়াছে > করেছে, করিয়াছিল > করেছিল॥

তিন॥ ২॥ 'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা'

(ক) Area বা এলাকা

'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা' প্রধানত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ পশ্চিম বাঁকুড়া ও সিংভূম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 'ঝাড়খণ্ডী' নামটি দিয়েছেন সুকুমার সেন। উল্লিখিত অঞ্চলটি একদা ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলে 'জঙ্গল মহল' নামেও পরিচিত ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এই অঞ্চলকেই বলা হয়েছে 'ঝারিখণ্ড'। ড. দ্বীরেন্দ্রনাথ সাহা বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল স্থানে 'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা' বিস্তৃত বলে জানিয়েছেন।

(খ) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার উদাহরণ :

অ দিদি, চিনাই দে ন কে বটে লকটী।
অ বিষ্টুপুরের হলদ মাখে গা করেছে আল।
অ বহিন, নামহ কুলহিতে মাদল বাজে
গান চিবাই চিবাই উটা ঘুরেঁ মরছে ভাল॥ অ দিদি গ ...

আদর্শ বাংলায় রূপান্তর :

ওগো দিদি, লোকটি কে বটে, আমাকে চিনিয়ে দাও। লোকটি বিষ্ণুপুরের হলুদ মেখে গা টি আলোর মতো উজ্জ্বল করেছে। ওগো বোন, নামোকুলিতে মাদল বাজছে। লোকটি গান চিবিয়ে চিবিয়ে সানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(গ) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য

এক॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১. ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য আনুনাসিক ধ্বনির প্রচুর প্রয়োগ।
যেমন : আটা > আঁটা, বাসা > বাঁসা। চা > চাঁ। গরুড় > গঁড়ুর। ঘড়া > ঘঁড়া। কুয়ো > কুঁই। জটা > জঁটা। দেশজ / আঞ্চলিক শব্দে অনুনাসিকতা: কঁকা (বোবা)। কঁচড় (কোমর)। আঁত (কাঠের দরজা)। ঠেঁন্ড (বদরাগী)।

২. ঝাড়খণ্ডী উপভাষাতে প্রায় সবত্রই 'ও'-কার লোপ পেয়ে 'অ' কারে পরিণত হয়েছে।
যেমন : লোক > লক; গোয়াল > গয়াল; মোটা > মটা, রোগা > রগা, ঘোড়া > ঘড়া। অশোক > অশক। আলো > আল।

৩. ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন : দূর > ধূর। কাঁকড়া > খাঁকড়া। তোকে > তখে। পতাকা > ফতকা। কাঠি > খাড়ি। নিতাম > দিথম।

৪. ঝাড়খণ্ডী উপভাষাতে 'ল' ও 'ন' এবং 'ব' ও 'ম' বিপর্যস্ত হয়েছে।
যেমন : নাতি > লাতি। লাল > নাল। নাচনী > লাচনী। যমুনা > যবুনা। রামায়ণ > রাবায়ণ।

৫. ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় মহাপ্রাণতার নবতর বৈশিষ্ট্য হলো :— 'হ্', 'ম্হ', 'ল্হ', 'র্হ' কিংবা 'ঢ' প্রভৃতির বিশিষ্ট ব্যবহার।
যেমন : কুমার > কুম্হার। কুমীর > কুম্হীর। কুলি > কুল্হি। পালা > পাল্হা। জোড়া > জোড়্হা। গেড়ি > গেড়্হি। কাল্হা (ঠাণ্ডা অর্থে)। চুল্হা (উনুন অর্থে)।

৬. ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় স্বরসঙ্গতির তেমন প্রভাব নেই।
যেমন : ধুলা > ধুলা। শিয়াল > শিয়াল।

৭. বহুবচনে 'গা', 'গিলা'র প্রয়োগ। যেমন : গরুগিলা ভড়রাঁই দে। কামিনগাকে যাতো বল্। ছঁড়াগা মরে নাইখ।

দুই ॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১। ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ক্রিয়াপদে সার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের প্রচুর ব্যবহার :
যেমন—যাবেক নাই। মরবেক। করবেক।

২। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় নাম-ধাতুর প্রচুর ব্যবহার :
যেমন— জাড়াচ্ছে। সিদাইছিল। মেঘ বিজলাচ্ছে। ভোকে খাবলাই মরছে। হড়বড়াই যাচ্ছে। চটাই দিব। পথরের জলটা গঁধাচ্ছে।

৩। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় 'আছ্' ধাতুর বদলে 'বট' ধাতুর প্রয়োগ :
যেমন— উ টা হুঁড়িডার বটে। কে বটে লক টি। বিটি বটে ন।

৪। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় বিভক্তির প্রয়োগ নিম্নরূপ :
(ক) কর্মে ও সম্প্রদান কারকে 'কে' বিভক্তি— জলকে গেছে, ঘরকে চল।
(খ) অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হল— 'লে', 'নু'। যেমন : মায়ের লে মাসীর দরদ। বাঁশের নু কঁইচি বড়। বেকারের নু বেগার ভাল।
(গ) অধিকরণে 'কে', 'এ' বিভক্তি। যেমন : কে = রাইতকে বাড় জাড়াবেক। কবকে যাবি গ। পাঁকে আল সুক শাঁকা। এ = সিতাএ সিঁদুর দে। কুলহিএ কেউ নাইখ। গাড়এ জল বটে ॥

তিন ॥ ৩ ॥ 'বরেন্দ্রী উপভাষা'

(ক) Area বা এলাকা

'বরেন্দ্রী উপভাষা' উত্তর বঙ্গে প্রচলিত। প্রধানত মালদহ, দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলার লোকমুখের ভাষাকেই 'বরেন্দ্রী উপভাষা' বলে।

ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন : একদা রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী একই উপভাষা ছিল। পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত 'বঙ্গালী' ও বিহার থেকে আগত 'বিহারী' উপভাষার নানা প্রভাব পড়ে মালদহ প্রভৃতি স্থানের মৌখিকভাষা একটি স্বতন্ত্র উপভাষা রূপে পরিগণিত হয়। তারই নাম 'বরেন্দ্রী'।

(খ) বরেন্দ্রী উপভাষার উদাহরণ :

মালদহ জেলার পশ্চিমাংশে ব্যবহৃত—
হতভাগা ছুয়া। হামি কহনু এ্যাকনা গরুডা দুয়ার দিয়ে হাটিত যা। উকি শুনছে? উ কয়ছে, বড়া জার লাগছে। গর্দানটা বড়া ওয়াক্ দিয়ে আছ। পালায় চড় হাটিনু।

(গ) বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :

এক ॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১. বরেন্দ্রী উপভাষায় ঠিক রাঢ়ী মতোই আনুনাসিক স্বরধ্বনি আছে।
যেমন— কাঁটা, চাঁদ, হাঁট, পুঁথি, ছুঁচ, পেঁচা।

২. বরেন্দ্রী উপভাষায় স্বরধ্বনি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। তবে এ > এ্যা হয়।
যেমন— দ্যান, দিল্যান, এ্যাক, দ্যাক, দ্যাও।

৩. বরেন্দ্রী উপভাষায় কেবলমাত্র শব্দের আদিতে সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকে। শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকলে সেগুলি অল্পপ্রাণ হয়ে যায়।
যেমন— বাঘ > বাগ।

৪. বরেন্দ্রী উপভাষায় বঙ্গালীর মতো জ > জ (z) রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন—জন > জন (zan), কালী পূজা > খালিফুজা। কাগজ > খাগজ।

৫. বরেন্দ্রী উপভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপ্রত্যাশিত স্থানে 'র' এর আগম বা লোপ।
যেমন :
(ক) শব্দের আদিতে যেখানে 'র' নেই, সেখানে 'র' এসে যায়— আম > রাম।
(খ) শব্দের আদিতে যেখানে 'র' আছে, তা আকস্মিক উচ্চারণে লোপ পায় ও 'অ' উচ্চারিত হয়— রস > অস।
উদাহরণ— রামবাবুর আমবাগান > আমবাবুর রামবাগান।
আমের রস > রামের অস।

৬. বরেন্দ্রী উপভাষায় শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

দুই ॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১। বরেন্দ্রী উপভাষায় কর্তৃকারকের বহুবচনে 'গুলি', 'গিলা', এবং অন্য কারকের বহুবচনে 'দের' বিভক্তি দেখা যায়।
যেমন : বান্দরগিলা। মাইয়াদের।

২। বরেন্দ্রী উপভাষায় অধিকরণ কারকে 'ত্' বিভক্তি প্রয়োগ দেখা যায়।
যেমন : মনে > মনত্; বুকে > বুকত্; বাড়িতে > বাড়িত্
(বাইগন বাড়ীত্ উভাও সার)

৩। বরেন্দ্রী উপভাষায় অতীত কালের উত্তম পুরুষে 'লাম'; ভবিষ্যত কালের উত্তম পুরুষে 'মু', 'ম' বিভক্তি দেখাযায়।
যেমন : 'হুলা গাড়লাম সারি সারিয়ে'; 'আর কতয়কাল রাখিম তালিম তোরক দিয়া ফাকি।'; 'মুই নাকী কামনে দিমু শাবি রে।'

৪। বরেন্দ্রী উপভাষাতে গৌণ কর্মে 'কে', 'ক' বিভক্তি দেখা যায়।
যেমন : 'হামাক দাও'; 'অবোন একটা পাগোলক্ ধরিয়া' ॥

তিন॥ ৪॥ 'বঙ্গালী উপভাষা'

ক) Area বা এলাকা

'বঙ্গালী উপভাষা' রাঢ়ী উপভাষার মতোই বিস্তার লাভ করেছে। পূর্ববাংলার এটি প্রধান উপভাষা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি বিশাল এলাকা জুড়ে 'বঙ্গালী উপভাষা' প্রচলিত।

তবুও মনে রাখতে হবে, এই সব জেলা গুলির মধ্যে লোকমুখের উচ্চারণে আরও অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

খ) বঙ্গালী উপভাষার উদাহরণ (ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত)

> হুইক্করপাইলা পোলারে। কি আর কমু? কোন্ হাত হাকালে কইচি— গরুডারে পানাইয়া বজ্জাতে বা। এমুন পোলা! তা নি কথা হোনে? কছ, হাঁতে ধরচে। ল্যাক্, যাড়ডা ধইরা টৈয়া অনু, মারব গতো যাপর।

গ) বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য

এক॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১. বঙ্গালী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতির সার্বিক প্রয়োগ। সাধারণ শব্দে তো বটেই, 'ক্ষ', 'ক্ষ্ম', 'জ্ঞ', বা 'য'-ফলা যুক্ত শব্দেও অপিনিহিতি বর্তমান।
   যেমন : করিয়া > কইর‍্যা; ধরিয়া > ধইর‍্যা; আজি > আইজ; লক্ষ > লইক্খ; ব্রাহ্ম > ব্রাইম্ম; যজ্ঞ > যইগ্গ।

২. বঙ্গালী উপভাষায় সংবৃত 'এ' > বিবৃত 'এ্যা'।
   যেমন : কেশ > ক্যাশ; তেল > ত্যাল; দেশ > দ্যাশ; কেন > ক্যান।

৩. বঙ্গালী উপভাষার 'র' ও 'ড়' এর প্রচণ্ড বিপর্যয়। অর্থাৎ এই উপভাষীরা 'ড়' কে 'র' এবং 'র' কে 'ড়' উচ্চারণ করে।
   যেমন : তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো > তারাতারি বারি আইসো। চার > চাড়, করি > কড়ি। ঘোড়ার গাড়ি > ঘোরার গারি। ঘরভাড়া > ঘড় ভারা।

৪. বঙ্গালী উপভাষাতে অনেক সময় 'ও' > 'উ' উচ্চারিত হয়।
   যেমন : কোদাল > কুদ্যাল; কোপ > কুপ; দোষ > দুষ। কোট > কুট।

৫. বঙ্গালী উপভাষাতে 'শ' এবং 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয়।
   যেমন : শালা > হালা; শাক > হাগ; সকল > হগল; বসো > বহো।

৬. বঙ্গালী উপভাষায় 'চ' > 'ৎস্', 'ছ' > 'স্' এবং 'জ' > 'জ' (z) উচ্চারিত হয়।
   যেমন : চাঁদু > চা (ৎসা) দু; খেয়েছে > খাইসে; জান দিলাম > জান (zan) দিমু।

৭. বঙ্গালী উপভাষাতে শব্দের আদিতে ও মধ্যে অবস্থিত 'হ',—'অ' রূপে উচ্চারিত হয়।
   যেমন : হতভাগা > অতোভাগা; হয় > অয়।

৮. বঙ্গালী উপভাষায় অনেক সময় শব্দের মধ্যস্থিত ট, ঠ— 'ড' তে রূপান্তরিত হয়।
   যেমন : দুইটি মিঠা পান দিলাম > দুইডি মিডা পান দিমু; এটা সেটা > ইডা- সিডা।

৯. বঙ্গালীতে অনেক সময় 'ল' > 'ন' লক্ষ্য করা যায়।
   যেমন : 'লক্ষ্মীপূজার নাড়ু' > 'নক্খী পুজার নারু'। লাউ > নাউ; লোভ > নোভ।

১০. বঙ্গালীতে অস্থানে আনুনাসিক আসে না— স্বস্থানেও আনুনাসিক লোপ পায়।
   যেমন : চাঁদ > চাদ। কাঁদা > কাদা। বাঁধন > বাধন।

দুই॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য॥

১। বঙ্গালী উপভাষায় কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে।
   যেমন : নবীন আসে > নবীনে আইসে। আপনি ঠিকই বলছেন > আপনে ঠিকই কইছেন। না হলে মানুষ বিশ্বাস করে না > না হইলে মাইনসে বিশ্বাস করে না।

২। বঙ্গালী উপভাষায় গৌণকর্মে 'রে' বিভক্তি হয়।
   যেমন : আমারে মারে ক্যান, 'তারে বাইসে দাও'।

৩। কর্তৃকারক ভিন্ন অন্য সব কারকে বহু বচনে 'রা', (রার) গো (গোর) বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : 'আমরার', 'আমাগোর', আমাগো, তোমাগো।

৪। অধিকরণকারকে 'এ', 'তে', 'ত' বিভক্তি যোগ হয়।
   যেমন : পাণিতে ভিজাও, 'জলে ডুইব্যা মর', 'ঘরিৎ কত্তা বাজে'।

৫। বঙ্গালীতে করণকারকে 'এ' বিভক্তি তো আছেই। এছাড়া 'দিয়া', 'লগে', 'সাথে' প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার।
   যেমন : তোরে দিয়া কাজ হবা না।

৬। বঙ্গালী উপভাষাতে অপাদান কারকে 'ত', 'তনে', 'তোন' এবং 'থন', 'থনে', 'থুন' ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার আছে।

৭। অতীত কালে (ক) উত্তম পুরুষের বিভক্তি 'আম্'—তার কথা হামি শুনতাম্ (শুনতাম)।
   (খ) মধ্যম পুরুষের বিভক্তি 'লা'। যেমন : আমগোর কি করলা।

৮। বঙ্গালী উপভাষাতে ভবিষ্যৎকালের উত্তমপুরুষের বিভক্তি 'ম', মধ্যম পুরুষের বিভক্তি 'বা' এবং প্রথম পুরুষের বিভক্তি 'ব'। যেমন :

> 'কোথায় পাইবাম কলসি কইন্যা।'
> 'তুমি তার কুনু কতা বুঝ্বা না।'
> 'তাহারে দিয়া এ কাম চল্‌বা না।'

৯। বঙ্গালী উপভাষায় যৌগিকক্রিয়াপদে 'ই' অন্ত অসমাপিকাক্রিয়া দিয়ে সম্পন্নকাল গঠন। যেমন : করিয়াছি > করসি, করতে আছি।

১০। বঙ্গালী উপভাষায় 'ইতে' অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে অসম্পন্ন কাল গঠন।
   যেমন : করিতেছি > কইরত্যাছি।

১১। বঙ্গালী উপভাষায় সামান্য বর্তমান দিয়ে ঘটমান বর্তমান প্রকাশ।
   যেমন : দুই ছালা কোবাকুবি কইর‍্যা মরে। মায়ে ডাকে।।

তিন॥ ৫॥ 'কামরূপী (বা রাজবংশী) উপভাষা'

(ক) Area বা এলাকা :

'কামরূপী (বা রাজবংশী) উপভাষা' প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট, কাছাড়, রংপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রচলিত।

এই উপভাষা অনেকটা বরেন্দ্রী ও অনেকটা বঙ্গালীর মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। কারো কারো ধারণা কামরূপী হলো কামরূপের নিকটবর্তী উপভাষা, তা 'বঙ্গালী'র রূপভেদ মাত্র।

আবার কেউ কেউ মনে করেন—কামরূপীর পূর্বদিকের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থেকেই অসমীয়া ভাষা গড়ে উঠেছে।

(খ) কামরূপী উপভাষার নিদর্শন :

তুই কোটে যাইস?
মুই কইল্‌কাতা যাবার ধরিচং।
কইল্‌কাতা এক আজব শহর। পৃথিবীর সগায় দেশের মানসি সেটে দেখির পাবু।
আসবু কুন দিন?
বছর ডেরেক পাছে।
চিনির পাবুতো? দেখিস কির গোটায় বকলি না যাইস। আমার গুদার কতাও মাঝে মাঝে মানত করবু।

(গ) কামরূপী উপভাষার বৈশিষ্ট্য

এক॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য॥

(১) কামরূপী উপভাষায় বরেন্দ্রীর মতো অপিনিহিতি আছে, তবে তুলনায় কম। যথা : আজি > আইজ।
(২) কামরূপী উপভাষায় বঙ্গালীর মতই 'র' এবং 'ড়'-এর বিপর্যয় ঘটে। যেমন : শাড়ী পরে বাড়ি যাব। > সারি পইরা বারি যামু।
(৩) কামরূপী উপভাষাতে বঙ্গালীর মতোই চ > ৎস, ছ > স; জ > দ, জ (Dz), ঝ > z হয়।
(৪) কামরূপী উপভাষাতে অনেক সময় 'ন' ও 'ল' -এর বিপর্যয় ঘটছে। যেমন—লাঙল > নাঙল, লাল > নাল। অপর পক্ষে— জননী > জলনী, নিলাম > লিলাম।
(৫) কামরূপী উপভাষায় শব্দের আদিতে মহাপ্রাণব্যঞ্জন বজায় থাকে। কিন্তু শব্দের মাঝে বা শেষে থাকলে, তা অল্পপ্রাণে পরিণত হয়।
(৬) কামরূপী উপভাষায় 'শ', 'ষ', 'স' সবই 'শ' উচ্চারিত হয়।
(৭) কামরূপীতে শব্দের 'অ' শ্বাসাঘাতের জন্য 'আ' উচ্চারিত হয়। যেমন— অতি > আতি; অসুখ > আসুখ; কথা > কাথা।
(৮) কামরূপীতে কখনো কখনো 'ও' > 'উ' হয়। যেমন— কোন > কুন, বোন > বুন।
(৯) কামরূপী উপভাষায় অনেক সময় স্বরধ্বনিতে অনুনাসিকতা দেখা যায়। যেমন—ইহা > ইঁহা; উহা > উঁহা।
(১০) কামরূপীতে কখনো কখনো শব্দের আদিস্থিত 'র' ধ্বনি বর্জিত হয় এবং 'অ' ধ্বনি রক্ষিত হয়। যেমন : রাতি > আতি; রাগ > আগ; রভস > অভশ।

দুই॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। কামরূপী উপভাষাতে মুখ্যকর্মে ও গৌণকর্মে 'ক' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : আমাকে ভাত দাও > হামাক বাত দাও।
২। কামরূপী উপভাষাতে অধিকরণে 'ত' এবং অপাদানে 'থাকি' অনুসর্গ যোগ হয়। যেমন : 'ঘরত যামু'। 'গাছত'। 'ঘর থাকি'।

৩। কামরূপী উপভাষাতে পুরুষভেদে সর্বনামের নিম্নোক্ত রূপ লক্ষ করি :
(ক) উত্তম পুরুষে 'মুই'—আমরা।
(খ) মধ্যম পুরুষে 'তুই'—তোমরা।
৪। কামরূপী উপভাষাতে মধ্যম পুরুষের অতীতকাল ও ভবিষ্যৎকালে 'উ' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : 'তুই করলু', 'তুই করবু'।
৫। কামরূপী উপভাষাতে 'ই' প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন : দেখি, পাই।
৬। কামরূপীতে যৌগিক ক্রিয়াপদে খোয়া ধাতুর ব্যবহার আছে। যেমন— রাগ করা > 'আগ খোয়া'; মনে লাগা > 'মনত খোয়া'।
৭। কামরূপীতে ক্রিয়াপদের পূর্বে নঞর্থ উপসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। (এ বৈশিষ্ট্য রাঢ়ীতেও আছে। যেমন : 'না জাও'; 'না দেখিম্'॥

☐ চার ☐ রাঢ়ী ও বঙ্গালী উপভাষার তুলনামূলক আলোচনা।

রাঢ়ী উপভাষা	বঙ্গালী উপভাষা
ভূমিকা	
১. 'রাঢ়ী' বাংলা-ভাষার একটি প্রধান উপভাষা। ২. প্রধানত রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত বলেই এর নাম 'রাঢ়ী' উপভাষা। ৩. রাঢ়ী উপভাষার প্রধান এলাকা হলো—পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও মর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ৪. রাঢ়ী উপভাষার একটি উদাহরণ : পূর্ব বাঁকুড়ায়—হতভাগা ছেল্যা! তুখে কখন বল্যেছি গরুটাক দুয়ে দিয়ে বাজারে যা। তা ছেল্যা কন কথা শুনব্যাক নাই। বলছে, জাড়াচ্ছে বটে। ঘাড় ধর‍্যে নিয়ে আসবো। গালে চড়াই দিব।	১. 'বঙ্গালী'ও বাংলা-ভাষার একটি প্রধান উপভাষা। ২. প্রধানত বঙ্গাল বা পূর্ববঙ্গে প্রচলিত বলেই এর নাম 'বঙ্গালী' উপভাষা। ৩. বঙ্গালী উপভাষার প্রধান এলাকা হলো—পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, নোয়াখালি ও কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ৪. বঙ্গালী উপভাষার একটি উদাহরণ : ঢাকা অঞ্চলে— ছাইক্কপাইলা পোলারে! কি আর কমু? কোন্ হাত হকালে কইছি—গরুডারে পানাইয়া বাজারে যা। এমুন পোলার পোলা! অ নি কথা হোনে? কয়, হীতে ধরছে। খ্যাক্, খাড়া ধইরা লৈয়া আমু, মারুম গালে থাপর।
ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	
১. 'ই', 'উ', 'ক্ষ', য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ'-কার 'ও'-কারে পরিণত হয়। যেমন—অতি > ওতি; মধু > মোধ; লক্ষ > লোক্খো, সত্য > সত্‌তো।	১. 'য'-ফলা, 'ক্ষ', 'জ্ঞ'-এর ক্ষেত্রে 'ই'-কার এর আগম ঘটে। যেমন—সত্য > সইত্য; বাক্য > বাইক্য; রাক্ষ > রাইক্ষ, রাক্ষস > রাইক্কস, যজ্ঞ > যইগগ।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রাঢ়ী উপভাষা	বঙ্গালী উপভাষা
২. রাঢ়ী উপভাষায় অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়ায় স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন— দেশি > দিশি; বিলাতি > বিলিতি; করিয়া > করে।	২. বঙ্গালী উপভাষায় অপিনিতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন— করিয়া > কইর‍্যা; রাখিয়া > রাইখ্যা।
৩. রাঢ়ী উপভাষায় অনুনাসিক স্বরের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—পুথি > পুঁথি।	৩. বঙ্গালী উপভাষায় অনুনাসিক স্বর নেই বললেই চলে। স্বস্থানে অনুনাসিকও উঠে গেছে। যেমন— চাঁদ > চাদ।
৪. রাঢ়ী উপভাষায় শব্দের আদি ধ্বনিতে শ্বাসাঘাত থাকায় পদান্ত ব্যঞ্জনে মহাপ্রাণতা লোপ পায়। যেমন— দুধ > দুদ। মাছ > মাচ। হঠাৎ > হটাৎ।	৪. বঙ্গালী উপভাষায় সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতা লোপ পায়। যেমন— ভাত > বাত; ঘা > গা।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকের বহুবচনে 'দের' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— আমাদের বই দাও।	১. কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকের বহুবচনে 'গো' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— হামাগো, তোমাগো।
২. গৌণকর্ম সম্প্রদানে ও অধিকারণে 'কে' ও 'তে' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন— 'আমি রামকে টাকা দিয়েছি'। 'কাকে বলব?' 'ঘরেতে এলো না সে।'	২. বঙ্গালী উপভাষাতে গৌণকর্ম সম্প্রদানে ও অধিকরণকারকে 'রে', 'তো' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন— 'রামেরে কৈসি'; বাড়িতো থাকুম'।
৩. রাঢ়ী উপভাষায় সামান্য অতীতে প্রথম পুরুষে অকর্মক ক্রিয়াপদে 'ল' বিভক্তি এবং সকর্মক ক্রিয়াপদে 'লে' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— সে গেল, সে দিলে।	৩. বঙ্গালী উপভাষায় সদ্য অতীত কালে উত্তম পুরুষের বিভক্তি 'লাম'। যেমন— আমি চললাম, আমি বললাম।
৪. রাঢ়ী উপভাষায় উত্তম পুরুষের পদ গঠনে 'লুম', 'নু' বিভক্তি যেমন—আমি বললুম', 'লাম', 'নু' বিভক্তি যেমন—আমি বললুম, আমরা বললাম। আমরা গেনু।	৪. বঙ্গালী উপভাষায় উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যতে, 'উম্' বা 'মু' বিভক্ত যুক্ত হয়। যেমন— 'আমি খেলুম না', 'আমি যামু'।
৫. রাঢ়ী উপভাষায় উত্তম পুরুষের পদগঠনের ক্ষেত্রে 'আছ্' ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষবিভক্তি যোগ করে ঘটমান ও পুরাঘটিত অতীতের রূপ গঠন করে। যেমন—কর্ + ছি > করছি; কর + ছিল > করছিল॥	৫. বঙ্গালী উপভাষায় সামান্য বর্তমান দিয়ে ঘটমান বর্তমান প্রকাশিত হয়। যেমন— মায়ে ডাকে (মা ডাকছে)॥